আমার বাংলা বই

পঞ্চম শ্রেণি

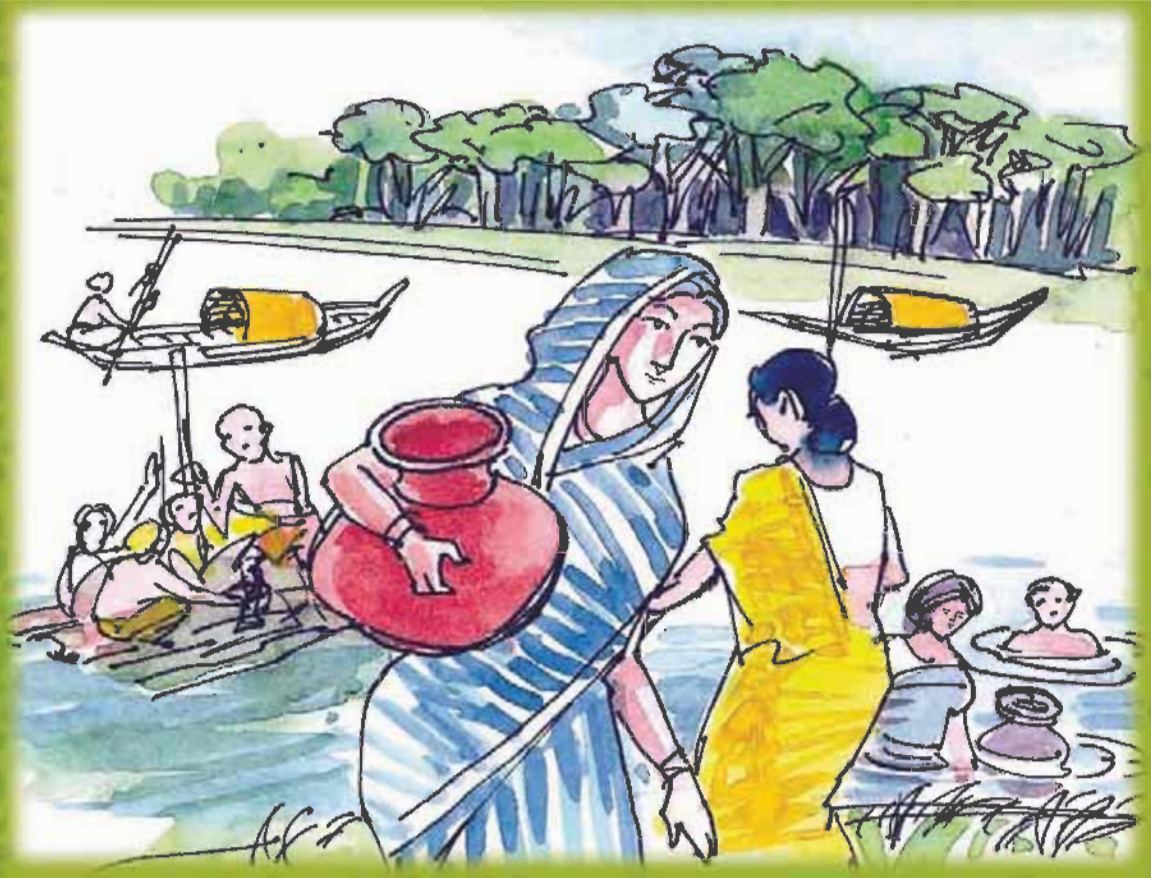

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় ঘন সবুজ রঙের ওপর উদীয়মান সূর্যের রঙের একটি লাল বৃত্ত থাকবে।

পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি

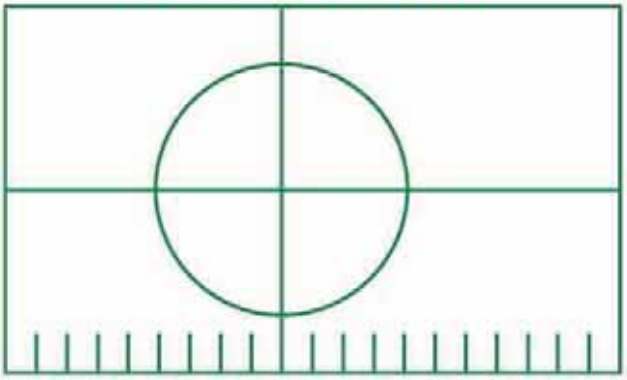

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য ৩০৫ সেমি (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেমি (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

ভবনে ব্যবহারের জন্য

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

৩০৫ সেমি x ১৮৩ সেমি (১০' x ৬')

১৫২ সেমি x ৯১ সেমি (৫' x ৩')

৭৬ সেমি x ৪৬ সেমি ($২\frac{১}{২}$' x $১\frac{১}{২}$')

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আমার বাংলা বই

পঞ্চম শ্রেণি

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা

হায়াৎ মামুদ
মহাম্মদ দানীউল হক
মাসুদুজ্জামান
আকিমুন রহমান

চিত্রাঙ্কন

হাশেম খান
গোলাম রাব্বানি শামীম

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম মুদ্রণ : ২০১২

সমন্বয়ক
শুভাশিস চক্রবর্ত্তী

গ্রাফিক্স
মোঃ আবুল হোসেন

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময় । তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই । শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞজন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনানিচয়ের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০–এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ । শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পরিশেষে শিখনফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পটভূমিতে শিক্ষাক্রমের প্রতিটি ধাপ নতুনভাবে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে যত্নসহকারে অনুসরণ করা হয়েছে।

বাংলা বাঙালির মাতৃভাষা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষাও বাংলা। ফলে বাংলা শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বাংলা কেবল একটি বিষয় নয়, এটি সকল বিষয় শেখার মাধ্যম। এদিক থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। তাই বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যেন শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা আনন্দময় পরিবেশে আয়ত্ত করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই পঞ্চম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীকে শিখনে আগ্রহী করা ও নির্ধারিত শিখনফল অর্জনে সহায়তা করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকটি পরিকল্পিত হয়েছে। এতে জীবন ও পরিবেশভিত্তিক এবং যুগের চাহিদার অনুকূল সহজ পাঠ প্রণয়ন করে সংগতিপূর্ণ চিত্র সন্নিবেশ করা হয়েছে। পাঠে শব্দ ও বাক্য সন্নিবেশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা যেমন বিবেচনা করা হয়েছে তেমনি বৈচিত্র্যময় করার দিকেও লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠকে যথাসম্ভব নির্ভার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সহজ ও সাবলীল বাক্য। একই সঙ্গে বিচিত্র বিষয় পাঠের মাধ্যমে নিত্য-নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়ে শিক্ষার্থী যেন তার শব্দভাণ্ডার ও ভাষাদক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে সেদিকটিও যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে। এ শ্রেণির শিশুদের জন্য নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা/শিখনফলভিত্তিক পাঠ ধারাবাহিক অনুশীলন ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে পাঠের শেষে অনুশীলনমূলক কাজের নমুনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এর ভিত্তিতে প্রণীত হয় পাঠ্যপুস্তক। লক্ষণীয় যে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয় ও টেকসই করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারও উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের চিত্র/ছবি ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণয়ন ও মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো। বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে।

এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হলেই আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	এই দেশ এই মানুষ	১
২	ফেব্রুয়ারির গান	৭
৩	সুন্দরবনের প্রাণী	১০
৪	সংকল্প	১৬
৫	হাতি আর শেয়ালের গল্প	২০
৬	শব্দদূষণ	২৬
৭	বীরের রক্তে প্রতিষ্ঠিত দেশ	২৯
৮	বই	৩৫
৯	শখের মৃৎশিল্প	৩৮
১০	স্বদেশ	৪৫
১১	কাঁকনমালা আর কাঞ্চনমালা	৫১
১২	অবাক জলপান	৬১
১৩	ঘাসফুল	৬৯
১৪	দেখে এলাম নায়াগ্রা	৭২
১৫	দুই তীরে	৭৭
১৬	ভাবুক ছেলেটি	৮১
১৭	প্রার্থনা	৮৮
১৮	স্মরণীয় যাঁরা চিরদিন	৯১
১৯	ফুটবল খেলোয়াড়	৯৭
২০	মাটির নিচে যে শহর	১০০
২১	হিমালয়ের শীর্ষে বাংলাদেশের পতাকা	১০৬
২২	রৌদ্র লেখে জয়	১১৩
২৩	অপেক্ষা	১১৬

এই দেশ এই মানুষ

আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা বাংলাদেশে জন্মেছি। আমরা বাংলাদেশের বাঙালি। তার মানে – বাঙালি আরও কোথাও আছে নাকি ? নিশ্চয়ই আছে। আমাদের একেবারে পাশে – ধর, তুমি চট্টগ্রাম বা সিলেটগামী ট্রেনে চেপে আখাউড়া বেড়াতে গেলে। এই আখাউড়া স্টেশন থেকে নেমে চার/পাঁচ কিলোমিটার পথ পেরুলেই পেয়ে যাবে সীমান্ত, অর্থাৎ যেখানটায় বাংলাদেশ আর ভারতের সীমানা দু-দিক থেকে এসে মিলেছে। ঐ সীমান্তের ওপারেই ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য। ত্রিপুরার লোকজনও বাঙালি, সকলেই বাংলায় কথা বলে। তুমি যদি পার্বত্য চট্টগ্রামে যাও, দেখতে পাবে আরও নানা ধরনের মানুষের বসবাস সেখানে। তারা নিজ নিজ ভাষায় কথা বলে।

এই যে এত কথা বলছি, তার একটাই উদ্দেশ্য। তা হলো – বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাঙালি হলেও তাদের ছাড়া আরও লোকজন আছে – চাকমা, গারো, সাঁওতাল, ত্রিপুরা, মুরং, তঞ্চঙ্গা ইত্যাদি। এদের ভাষা এদের নিজেদের। দৈনন্দিন জীবনযাপন, আনন্দ-উৎসব তাদের নিজেদের। একই দেশ, অথচ কত বৈচিত্র্য। এটাই বাংলাদেশের গৌরব। আমরা যারা এই দেশে বাস করি, তাদের সবার গৌরব। কোনো দেশে যদি নানান ধরনের নানান জাতির মানুষ থাকে, তখন সে দেশের সুখ্যাতি হয়। আমরা নানা জাতের মানুষ এই যে মিলেমিশে বন্ধুর মতো বসবাস করছি, এতেই আমাদের আনন্দ। ধর্মের কথাই ভাবা যাক। আমাদের দেশে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, বৌদ্ধ আছে, খ্রিস্টান রয়েছে, এমনকি অল্প সংখ্যক জৈন ধর্মের মানুষও আছে। এত বৈচিত্র্য খুব কম দেশেই থাকে।

বাংলাদেশের এই যে মানুষ, তাদের পেশাও কত বিচিত্র। কেউ জেলে, কেউ কুমোর, কেউ কৃষক, কেউ আবার কাজ করে অফিসে-আদালতে। সবাই আমরা পরস্পরের বন্ধু। একজন তার কাজ দিয়ে আরেক জনকে সাহায্য করছে। গড়ে তুলছে এই দেশ। ভাব তো কৃষকের কথা। তারা কাজ না করলে আমাদের খাদ্য জোগাতো কে? সবাইকে তাই আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে, ভালোবাসতে হবে। সবাই আমাদের আপনজন।

এভাবেই তো সবাইকে নিয়ে আমরা আনন্দে আছি। কিন্তু সেই আনন্দ কী রকমের? একধরনের আনন্দ হচ্ছে নানা ধরনের উৎসব নিয়ে। মুসলমানদের দুটো ঈদ রয়েছে, রয়েছে মহর্‌রম। হিন্দুদের দুর্গা পূজাসহ এত উৎসব আছে যে, 'বারো মাসে তের পার্বণ' লেগেই থাকে। বৌদ্ধদের আছে সারা বছরে কয়েকটি বৌদ্ধ পূর্ণিমা। খ্রিস্টানদের আছে ইস্টার সানডে, তা ছাড়া ২৫শে ডিসেম্বর, মানে 'বড় দিন'। এর সবই তো আমরা উদ্‌যাপন করি।

পোশাকআশাকও কত ভিন্ন ভিন্ন ধরনের, ভিন্ন ভিন্ন ধাঁচের। মিল আমাদের একটা জায়গায় – সকলেই আমরা বাংলাদেশের অধিবাসী। আরেকটা মিল আছে – অধিকাংশ মানুষ বাংলা ভাষাভাষী। বাংলাভাষার বাইরেও অন্য ভাষার মানুষও কমবেশি আছে বাংলাদেশে। গারোদের নিজস্ব ভাষা আছে, আছে চাকমা, ত্রিপুরা বা সাঁওতালদেরও। বাংলাদেশ যেন একটা বড় বাগান। বাগানে কত রকমের গাছপালা – বড় গাছ, ছোট গাছ। কোনো গাছে ফুল ফোটে, কোনো গাছে ঝুলন্ত ফল বাতাসে দোল খায়। বাংলাদেশও সেই রকম। নানা ধরনের মানুষ, নানা ধরনের পেশা।

বাংলাদেশের জনজীবন তাই ভারি বৈচিত্র্যময়। এই দেশকে তাই ঘুরে ঘুরে দেখা দরকার। কোথায় পাহাড়, কোথায় নদী, কোথায়-বা এর সমুদ্রের বেলাভূমি। আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে কয়েক দিন কাটিয়ে আসা – এভাবেও কত কিছু দেখা যায়। মানুষকে এভাবেই তো ভালোবাসতে হবে। মানুষে মানুষে মিলেমিশে থাকলেই তো ভালোবাসা জন্মাবে।

দেশকে তাই যতটা পারা যায়, কাছে থেকে দেখতে হবে। দেশ মানে এর মানুষ, জনপদ, নদী, আকাশ, প্রান্তর , পাহাড়, সমুদ্র এইসব। দেশ হলো আসলে জননীর মতো। মা যেমন স্নেহ মমতা ভালোবাসা দিয়ে আমাদের আগলে রাখেন, দেশও তেমনই তার আলো বাতাস সম্পদ দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। মাকে আমরা যেমন ভালোবাসি, দেশকেও তেমনই ভালোবাসতে হবে। দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই সার্থক হয়ে উঠবে আমাদের জীবন।

পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই এবং বাক্য তৈরি করে বলি ও লিখি।

সৌভাগ্য – ভালো ভাগ্য।
সীমান্ত – শেষ প্রান্ত।
সংখ্যাগরিষ্ঠ – সংখ্যায় সরচেয়ে বেশি এমন।
দৈনন্দিন – প্রতিদিনের
বৈচিত্র্য – বিভিন্নতা।
সুখ্যাতি – সুনাম, প্রশংসা।
বেলাভূমি – সমুদ্রের তীরে বালুময় স্থান।
প্রান্তর – মাঠ, জনবসতি নেই এমন বিস্তীর্ণ স্থান।
স্বজন – নিজের লোক, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব।
সার্থক – সফল।
জনপদ – লোকজনের বসতি রয়েছে এমন জায়গা।

২. নিচের অনুচ্ছেদ অবলম্বনে ৫টি প্রশ্ন তৈরি করি।

দেশকে তাই যতটা পারা যায়, কাছে থেকে দেখতে হবে। দেশ মানে এর মানুষ, জনপদ, নদী, আকাশ, প্রান্তর, পাহাড়, সমুদ্র এইসব। দেশ হলো আসলে জননীর মতো। মা যেমন আমাদের স্নেহ মমতা ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখেন, দেশকেও তেমনই আমাদের ভালোবাসতে হবে। দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই সার্থক হয়ে উঠবে আমাদের জীবন।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।

(ক) বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও আর কোন ধরনের মানুষ বাস করে ?
(খ) বাংলাদেশের গৌরব কিসে ?
(গ) বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মের উৎসবগুলোর নাম কী ?
(ঘ) "বাগানে কত রকমের গাছপালা – বড় গাছ, ছোট গাছ।" – এ কথার দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে ?
(ঙ) দেশকে কেন ভালোবাসতে হবে ?

৪. বিপরীত শব্দ লিখি।

বাঙালি	–	অবাঙালি
দূরে	–	নিকটে
সংখ্যাগরিষ্ঠ	–	সংখ্যালঘিষ্ঠ
বন্ধু	–	শত্রু
শ্রদ্ধা	–	অশ্রদ্ধা
দেশ	–	বিদেশ
সার্থক	–	ব্যর্থ

৫. কর্ম-অনুশীলন।

(ক) বাংলাদেশের যে কোনো উৎসব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করি।

(খ) শিক্ষকের নির্দেশনায় নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে (৩ দিন/৪ দিন পর পর) টেলিভিশন/রেডিও/খবরের কাগজে প্রচারিত সংবাদ দেখে/শুনে/পড়ে নিচের ছক অনুযায়ী আলাদা কাগজে তা লিখে আনি। পরে শ্রেণিতে পড়ে শোনাই ও অন্যদের লেখা শুনি।

তারিখ	আনন্দের সংবাদ	দুঃখের সংবাদ	খেলার সংবাদ

ফেব্রুয়ারির গান

লুৎফর রহমান রিটন

দোয়েল কোয়েল ময়না কোকিল
সবার আছে গান
পাখির গানে পাখির সুরে
মুগ্ধ সবার প্রাণ।

সাগর নদীর ঊর্মিমালার
মন ভোলানো সুর
নদী হচ্ছে স্রোতস্বিনী
সাগর সমুদ্দুর।

ছড়ায় পাহাড় সুরের বাহার
ঝরনা-প্রকৃতিতে
বাতাসে তার প্রতিধ্বনি
গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে।

গাছের গানে মুগ্ধ পাতা
মুগ্ধ স্বর্ণলতা
ছন্দ-সুরে ফুলের সাথে
প্রজাপতির কথা।

ফুল পাখি নই, নইকো পাহাড়
ঝরনা সাগর নই
মায়ের মুখের মধুর ভাষায়
মনের কথা কই।

বাংলা আমার মায়ের ভাষা
শহিদ ছেলের দান
আমার ভাইয়ের রক্তে লেখা
ফেব্রুয়ারির গান।

পাঠ শিখি

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্রসমাজ এই দিনে আন্দোলন শুরু করে। ছাত্রদের মিছিলে পাকিস্তানি সরকার গুলি চালায়। সালাম, বরকত, শফিক, জব্বার ও আরও অনেক ছাত্র (যাদের নাম জানা যায়নি) শহিদ হন। ঐ ঘটনা অবলম্বন করে কবি লুৎফর রহমান রিটন 'ফেব্রুয়ারির গান' কবিতাটি লিখেছেন। বাংলা ভাষার প্রতি মমতা আর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়।

২. নিচে শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই ও ব্যবহার শিখি।

মুগ্ধ – বিমোহিত, আনন্দিত। লালন সাঁই ও হাছন রাজার গান আমাদের মুগ্ধ করে।

ঊর্মি – নদী ও সাগরের ঢেউ। ঊর্মিমুখর নদী বা সাগর দেখলে সবাই ভয় পায়।

ঊর্মিমালা – ঢেউসমূহ, ঢেউগুলো। ('মালা' শব্দটি দিয়ে বহুবচন তৈরি হয়েছে)।

স্রোতস্বিনী – নদী। পাহাড় থেকে নেমে আসা স্রোতস্বিনী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে।

সমুদ্দুর – সমুদ্র, সাগর। সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে ছিল রূপকথার এক দেশ।

বাহার – সৌন্দর্য। তার জামা কাপড়ের বাহার দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

স্বর্ণলতা – সোনালি রঙের বুনো লতা। অনেক সময় পথের ধারের গাছাগাছালি ভরে থাকে। এই লতা আপনা-আপনি জন্মায়। মেঠো পথের দু-পাশের স্বর্ণলতা যেন রাস্তা আলো করে রেখেছে।

প্রতিধ্বনি – বাতাসের ধাক্কায় ধ্বনির পুনরায় ফিরে আসাকে প্রতিধ্বনি বলে। মিছিলের শ্লোগানগুলো ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে চারিদিক মুখরিত করে তুলছে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।

(ক) কবি কোন 'মন ভোলানো সুর' সম্বন্ধে বলেছেন ?

(খ) গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতের বাতাসে কিসের প্রতিধ্বনি ছড়ায় ?

(গ) পাতা মুগ্ধ হচ্ছে, স্বর্ণলতা মুগ্ধ হচ্ছে কিসের গানে ?
(ঘ) আমরা কোন ভাষাতে আমাদের মনের কথা বলি ?
(ঙ) 'শহিদ ছেলের দান' হিসেবে আমরা কী পেয়েছি ?

৪. কর্ম-অনুশীলন।

একুশে ফেব্রুয়ারি সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করি।

কবি পরিচিতি

লুৎফর রহমান রিটন

লুৎফর রহমান রিটন ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। বিচিত্র বিষয়ে ছড়া ও কবিতা রচনা করে তরুণ বয়সেই তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ছড়া ছাড়াও তিনি গল্প-উপন্যাস লেখেন। এরই স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৭ সালে তিনি লাভ করেন বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার। টেলিভিশনের উপস্থাপক হিসেবেও তিনি খ্যাতিমান। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিশুতোষ গ্রন্থ : 'ধুত্তুরি', 'ঢাকা আমার ঢাকা', 'ছড়া ও ছবিতে মুক্তিযুদ্ধ', 'ভূতের বিয়ের নিমন্ত্রণে', 'বাচ্চা হাতির কাণ্ডকারখানা' ইত্যাদি।

সুন্দরবনের প্রাণী

বিশ্বে কোনো কোনো প্রাণীর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দেশের নাম বা জায়গার নাম। যেমন, ক্যাঙ্গারু বললেই অস্ট্রেলিয়ার কথা মনে হবে। সিংহ বললেই মনে হবে আফ্রিকার কথা। তেমনি বাঘ বা টাইগার শুনলেই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের কথা স্মরণ হবেই। এর অর্থ – পৃথিবীর অন্য কোথাও টাইগার বা বাঘের দেখা যদি মেলেও, তবু বাংলাদেশের টাইগারের কোনো তুলনা নেই। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অনন্য, তুলনাহীন। এই বাঘ ছাড়াও এক

সময়ে চিতাবাঘও প্রচুর ছিল সুন্দরবনে। কিন্তু এখন আর দেখা যায় না। ওলবাঘ নামেও এক ধরনের বাঘ এখানে আগে দেখতে পাওয়া যেত, বর্তমানে আর তা দৃষ্ট হয় না। এতদ্ব্যতীত গণ্ডারও ছিল যথেষ্ট, এখন তা সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত। কয়েক শত বৎসর পূর্বে রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁর যৌবনকালে এ জঙ্গলে গণ্ডার শিকারে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন বলে জানা যায়।

ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে, অর্থাৎ শতিনেক বছর আগে, সুন্দরবনে গণ্ডারের সংখ্যাধিক্য ছিল। কিন্তু সেই গণ্ডার এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ইংরেজ শাসক ও দেশীয় কর্মচারী এবং স্থানীয় দক্ষ শিকারী সকলে মিলে ক্রমান্বয়ে গণ্ডারের বংশ ধ্বংস করেছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভ্রাতা নলিনীভূষণ রায় ১৮৮৫ সালে সুন্দরবনে শেষ গণ্ডার দেখেছিলেন বলে জানা যায়। একসময়ে এখানে হাতিও ছিল, এখন একটিও নেই। বর্তমানে একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে হাতির দেখা মেলে।

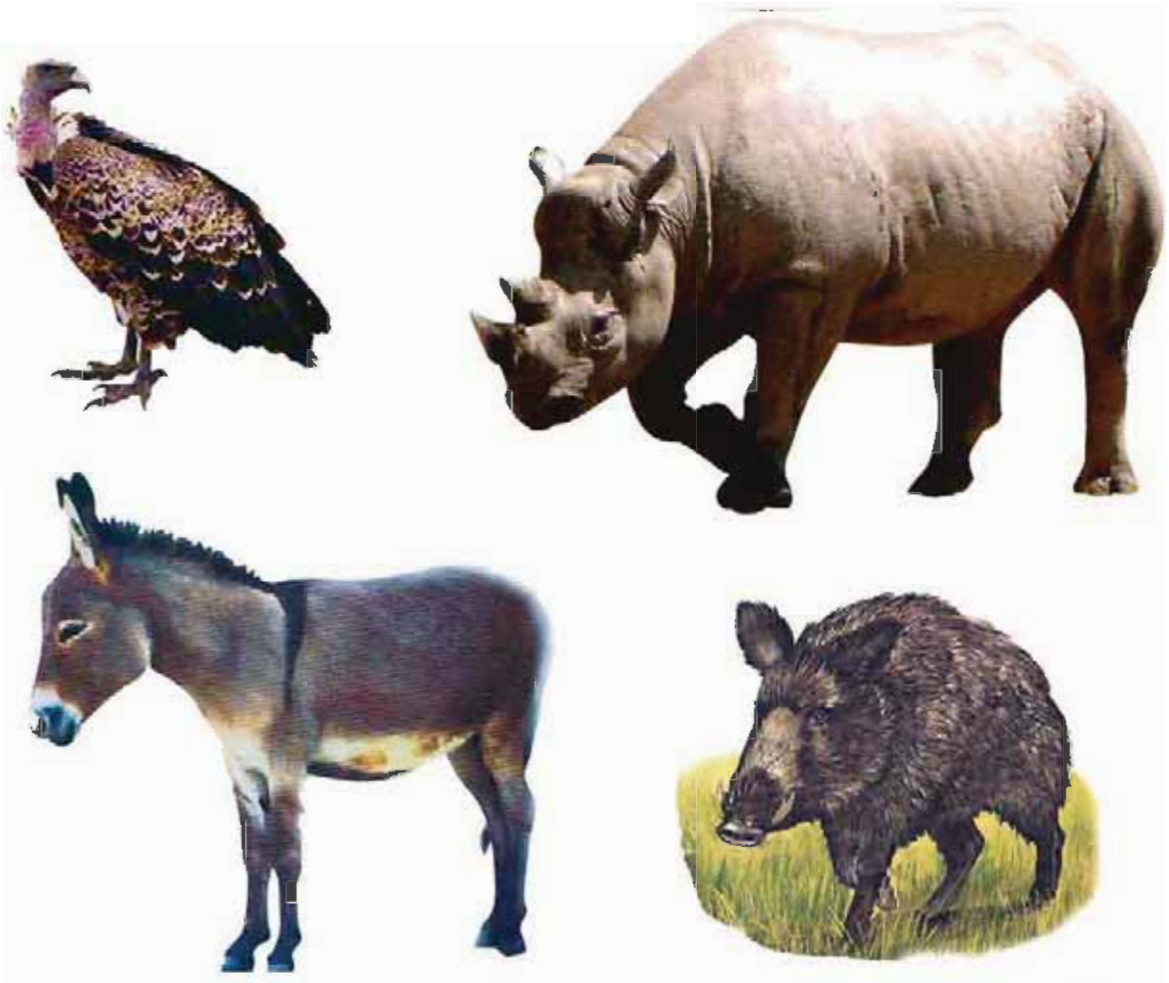

যে কোনো দেশে যেসব জীবজন্তু পশুপাখি দেখা যায় সে সব প্রাণী সেই দেশের অমূল্য সম্পদ। দেশের জলবায়ু আবহাওয়া গাছপালা বৃক্ষলতা ইত্যাদি সবকিছু মিলে যে প্রাকৃতিক অবস্থার সৃষ্টি করে সেই পরিমণ্ডলেই সে দেশের প্রাণীকুল জীবনধারণ করে থাকে। যদি তেমন অবস্থার বিঘ্ন ঘটে, তখন জীবজন্তু পশুপাখি সকলেরই বেঁচে থাকা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। একটি বিষয় আমাদের একেবারেই মনে থাকে না, অথচ সর্বদা স্মরণে রাখা কর্তব্য। তা হলো – পৃথিবীতে কোনো অপ্রয়োজনীয় প্রাণী বা বৃক্ষলতা বলতে কিছুই নেই, সবই দরকার। এখন বাংলাদেশে শকুন প্রায় দেখাই যায় না। শকুনকে কেউ সুন্দর পাখি বলে না, তার স্বভাব আচার-আচরণও খারাপ – যাবতীয় অখাদ্যকে সে তার খাদ্য হিসেবে বিবেচনা করে, শকুন কেউ পোষে না। অথচ শকুন ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হচ্ছে বলে গবেষকগণ খুবই চিন্তিত ও বিমর্ষ। তাঁরা বলছেন, মানুষের পক্ষে যা ক্ষতিকর, সেইসব আবর্জনা শকুন খেয়ে ফেলে এবং সে কারণেই আমাদের চারদিকের পরিমণ্ডল বসবাসের যোগ্য রয়েছে। আমরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছি না। ফলে, শকুন সত্যিকার অর্থে মানুষের উপকার ছাড়া অপকার করে না।

বাঘের বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য। বাঘ হিংস্র প্রাণী, জীবজন্তু খেয়ে ফেলে, মানুষকেও খায়। তথ্য হিসেবে সবই সত্য কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাণিবিদরা বলছেন যে, বাঘও সুন্দরবনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাণী। বাঘের সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে বলে এখন তাঁরা চিন্তিত । ফলে, আইন করে বাঘ শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, যে সব দেশে বাঘ রয়েছে সে সব দেশেও ব্যাঘ্রশিকার দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে বাঘ এখন বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী – এ কথা সকলেই বলছেন এবং সেজন্য সকলেই চিন্তিত । প্রাণী, বৃক্ষলতা ইত্যাদি সব কিছুই প্রকৃতির দান। তাকে ধ্বংস করতে নেই, ধ্বংস করলে প্রাকৃতিক নিয়মকেই ধ্বংস করা হয়।

'রয়্যাল বেঙ্গাল টাইগার' নামটি পৃথিবীতে সবাই জানে, এবং জানে যে এই টাইগার বেঙ্গালে, অর্থাৎ বাংলাদেশেই একমাত্র দেখা যায়। যদি বাঘই না থাকে, তো রয়্যাল বেঙ্গাল থাকবে কীভাবে? বাঘকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা আমাদের উচিত ও কর্তব্য। সাধারণ মানুষজনকেও এই কথা বুঝতে হবে।

পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার জেনে নিই।

অবলুপ্ত – যা লোপ পেয়েছে। মাটি খুঁড়ে অবলুপ্ত অনেক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেছে।

দক্ষ – নিপুণ, পটু, পারদর্শী। ছেলেটি সাঁতারে খুব দক্ষ।

ভক্ষণ করা – খাওয়া। ভালো মতো চর্বণ করে ভক্ষণ না করলে খাবার সহজে হজম হয় না।

এতদ্ব্যতীত – এ ছাড়া। ছেলেটি পড়াশোনায় খুবই ভালো, এতদ্ব্যতীত খেলাধুলাতেও তার জুড়ি নেই।

অমূল্য – যার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। সুস্বাস্থ্যই জীবনের অমূল্য সম্পদ।

স্মরণে রাখা – মনে রাখা। বইয়ের পড়া স্মরণে রাখার জন্যে ভোরবেলায় উঠে পড়তে হয়।

বিমর্ষ – দুঃখিত। তার কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়, নইলে সর্বদা বিমর্ষ থাকে কেন?

প্রযোজ্য – যা প্রয়োগ করা যায়। তুমি যা বললে তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

দণ্ডনীয় – শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। চুরি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

কর্তব্য – যা করা প্রয়োজন। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান কর্তব্য পড়াশোনা করা।

নিষিদ্ধ – যা নিষেধ করা হয়েছে। স্কুলের যত্রতত্র থুথু ফেলা নিষিদ্ধ।

যথেষ্ট – প্রচুর। তার যথেষ্ট বিষয়সম্পত্তি, সংসার চালাতে কষ্ট করতে হয় না।

রয়্যাল (royal) – রাজকীয়। রয়্যাল বেঙ্গালের মতো দেখতে সুন্দর বাঘ বিশ্বের আর কোথাও নেই।

২. জেনে রাখি।

অস্ট্রেলিয়া – এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকার মতো একটি মহাদেশ।

ক্যাঙ্গারু – একমাত্র অস্ট্রেলিয়াতেই পাওয়া যায় এমন একটি প্রাণী। এদের চারটি পা, কিন্তু পেছনের দু-পা বড়ো আর সামনের দু-পা ছোট। তার ফলে অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণীর মতো হাঁটাচলা করতে পারে না এরা, পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এরা চলে। এদের বুকের নিচে একটা থলিতে এরা বাচ্চা রাখে।

চিতাবাঘ – একপ্রকার বাঘ। অন্য বাঘের সঙ্গে চিতাবাঘের পার্থক্য হলো, চিতাবাঘ গাছে উঠতে পারে, অন্যান্য বাঘ পারে না। বাঘেদের মধ্যে এরা সবচেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে।

অনন্য – অদ্বিতীয়, একক। বাঙালি জাতির ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অনন্য বীর, তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মদাতা।

গন্ডার – কালো রঙের চতুষ্পদ প্রাণী, উচ্চতায় ও লম্বায় গরুর আকারের। এদের নাকের ওপরে একটা শিং থাকে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

(ক) ক্যাঙ্গারু কোথায় দেখা যায় ?
(খ) সুন্দরবনে কি গন্ডার পাওয়া যায় ?
(গ) বাংলাদেশে হাতি কোন অঞ্চলে দেখা যায় ?
(ঘ) শকুন কীভাবে মানুষের উপকার করে ?

৪. নিচের বাক্য দুটি পড়ি।

মানুষের পক্ষে যা ক্ষতিকর সেইসব আবর্জনা শকুন খেয়ে ফেলে। সে সত্যিকার অর্থে মানুষের উপকার ছাড়া অপকার করে না।

উপরের বাক্য দুটিতে অনেকগুলো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দই এক-একটি পদ :

শকুন	–	বিশেষ্য পদ
ক্ষতিকর	–	বিশেষণ পদ
সে	–	সর্বনাম পদ
খেয়ে ফেলে	–	ক্রিয়া পদ
ছাড়া	–	অব্যয় পদ।

পদ পাঁচ প্রকার : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয়।

৫. আমার দেখা বাংলাদেশের যে কোনো একটা প্রাণী সম্পর্কে রচনা লিখি।

৬. কর্ম-অনুশীলন।

আমি এমন প্রাণীদের একটি তালিকা তৈরি করি – যাদের নাম শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি। পরে শ্রেণির সকলের সাথে তা মিলিয়ে দেখি।

সংকল্প

কাজী নজরুল ইসলাম

থাকব না ক বদ্ধ ঘরে
দেখব এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
ছুটছে তারা কেমন করে,
কিসের নেশায় কেমন করে
মরছে যে বীর লাখে লাখে।
কিসের আশায় করছে তারা
বরণ মরণ যন্ত্রণাকে।

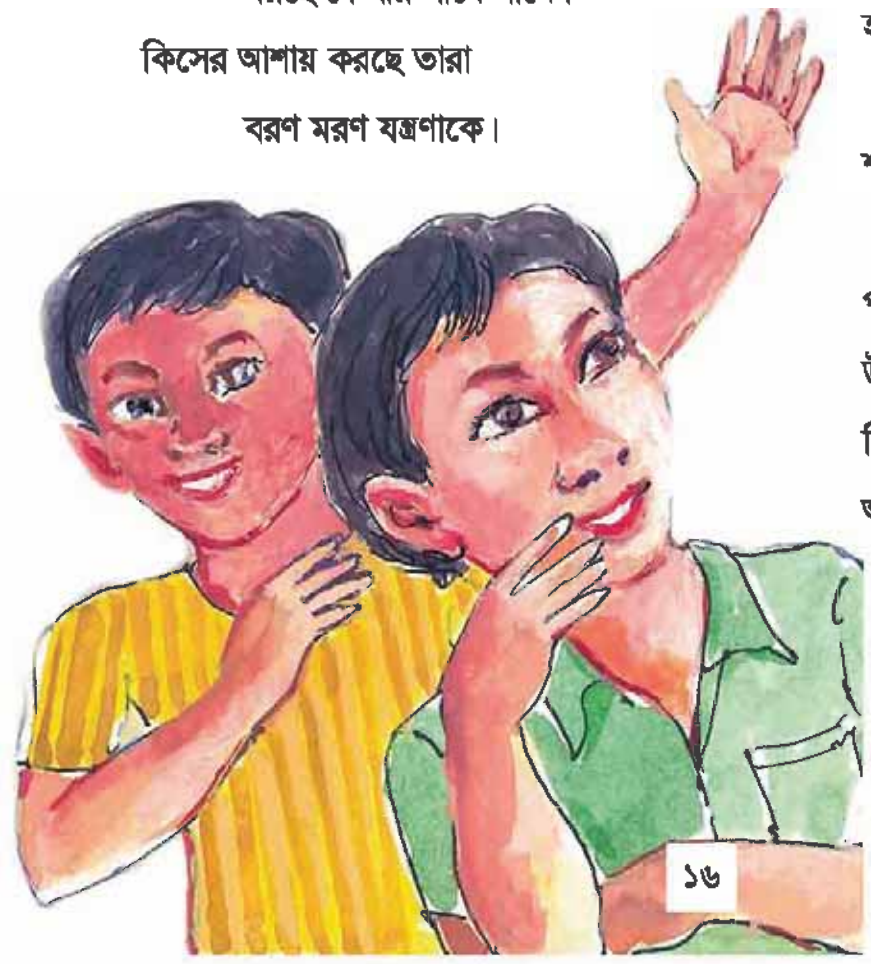

হাউই চড়ে চায় যেতে কে
চন্দ্রলোকের অচিনপুরে,
শুনব আমি ইঙ্গিত কোন
মঙ্গল হতে আসছে উড়ে।
পাতাল ফেড়ে নামব আমি
উঠব আমি আকাশ ফুঁড়ে,
বিশ্বজগৎ দেখব আমি
আপন হাতের মুঠোয় পুরে।

(সংক্ষেপিত)

পাঠ শিখি

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

অসীম বিশ্বকে জানার এক অদম্য কৌতূহল মানুষের। কিশোরেরও তাই। সে জানতে চায় বিশ্বের সকল কিছুকে, আবিষ্কার করতে চায় অসীম আকাশের সকল অজানা রহস্যকে। সে বুঝতে চায় কেন মানুষ ছুটছে অসীমে, অতলে, অন্তরীক্ষে; বীর কেন জীবনকে অনায়াসে বিপন্ন করে, কেন বরণ করে মৃত্যুকে। সে জানতে চায় ডুবুরি কেন ডুবছে, দুঃসাহসী কেন উড়ছে। তাই কিশোর মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে – সে বদ্ধ ঘরে বসে থাকবে না। পৃথিবীটাকে সেও ঘুরে ঘুরে দেখবে।

২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার জেনে নিই।

সংকল্প – তীব্র ইচ্ছা, প্রতিজ্ঞা। ভালো কাজ করার জন্য সংকল্প থাকা দরকার।

বদ্ধ – বন্ধ। বদ্ধ ঘরে আলো বাতাস ঢুকতে পারে না।

যুগান্তর – এক যুগের পর আরেক যুগ। অন্য যুগ। দেশি গণনা মতে ১২ বছরে এক যুগ হয়। অনেক যুগ-যুগান্তর পার হয়ে আমরা বর্তমান সময়ে এসেছি।

দেশান্তর – এক দেশ থেকে আর এক দেশ। অন্যদেশ। বড় হলে আমি দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াব।

কিসের নেশায় – কী উদ্দেশ্যে, কী আকর্ষণে। কিসের নেশায় তুমি এমন ছুটোছুটি করছ?

বরণ – কোনো কিছু সাদরে গ্রহণ। পয়লা বৈশাখে আমরা বাংলা নতুন বছরকে বরণ করে নিই।

মরণ-যন্ত্রণা – মৃত্যুর মতো কঠিন যন্ত্রণা। যারা সাহসী তারা মরণ-যন্ত্রণাকে ভয় পায় না।

ডুবুরি – যারা গভীর পানিতে ডুব দিয়ে কোনো জিনিস উদ্ধার করে আনে। মেঘনা নদীর গভীর তলদেশ থেকে ডুবুরিরা ডুবে যাওয়া লঞ্চটি উদ্ধার করেছে।

দুঃসাহসী – অত্যধিক সাহসী। দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন করেছেন।

চন্দ্রলোক – চাঁদের দেশ। মানুষ এখন চন্দ্রলোক ছাড়িয়ে মঙ্গল গ্রহেও যাত্রা করছে।

অচিনপুর – অচেনা জায়গা। এক ছিল অচিনপুরের রাজকন্যা।
ফেড়ে – চিরে, দু ফাঁক করে। কাঠুরে কুড়াল দিয়ে কাঠটা ফেড়ে ফেলল।

৩. সমার্থক শব্দ জেনে নিই।

সংকল্প	–	প্রতিজ্ঞা
বদ্ধ	–	বন্ধ
ইঙ্গিত	–	ইশারা
সিন্ধু	–	সাগর
বরণ	–	সাদরে গ্রহণ
জগৎ	–	পৃথিবী

৪. ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত রূপ জেনে নিই।

চলিত রূপ	সাধু রূপ
আঁকব	আঁকিব
দেখব	দেখিব
ঘুরছে	ঘুরিতেছে
মরছে	মরিতেছে
করছে	করিতেছে
ছুটছে	ছুটিতেছে
আসছে	আসিতেছে
চলছে	চলিতেছে

৫. ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে জেনে নিই।

(ক) যে সময়ে ক্রিয়া বা কাজটি সম্পন্ন হয় তাকে ক্রিয়ার কাল বলে। যেমন : অতীত কাল, বর্তমান কাল, ভবিষ্যৎ কাল।
(খ) ভবিষ্যৎ কালবাচক কয়েকটি ক্রিয়াপদের সঙ্গে পরিচিত হই : থাকব, দেখব, শুনব, খাব, বেড়াব, ঘুরব, পড়ব, খেলব, চলব, চড়ব, নামব, ধরব, হাসব।

৬. শব্দগুলোর বানান লিখি।

বরণ, মরণ, যন্ত্রণা (এই তিনটির শেষে 'ণ' বসে), বন্ধ, যুগান্তর, সিন্ধু, সেঁচে, বিশ্বজগৎ, ইঙ্গিত।

৭. প্রশ্নগুলো উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।

(ক) কবি বন্ধ ঘরে থাকতে চান না কেন ?
(খ) বীর ডুবুরি কী করে ?
(গ) চন্দ্রলোকের অচিনপুরে কারা যেতে চায় ?
(ঘ) কবি পাতাল ফেড়ে নামতে চান কেন ?

৮. কবির সংকল্পগুলো লিখি।

৯. আমার সংকল্পগুলো লিখি।

১০. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও মুখস্থ লিখি।

১১. কবি পরিচিতি।

কবি পরিচিতি	
কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ ২৪শে মে, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ, (১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সন)। তিনি বিদ্রোহী কবি নামেই বেশি পরিচিত। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তাঁর কবিতা, গান, গল্প, নাটক, উপন্যাস আমাদের সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শিশুদের জন্য তিনি অনেক গান, কবিতা, ছড়া ও নাটক লিখেছেন। 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ঝিঙে ফুল' তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট, (১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ সন) ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

হাতি আর শেয়ালের গল্প

সে অনেক-অনেক দিন আগের কথা। চারদিকে তখন কী সুন্দর সবুজ বন, ঝোঁপঝাড় আর দিগন্তে ঝুকে পড়া নীল আকাশের ছোঁয়া। এরকম দিনগুলোতে মানুষেরা থাকে লোকালয়ে আর পশুরা জঙ্গলে।

মানুষ তখন একটু একটু করে সভ্য হচ্ছে। কী করে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকা যায়, শিখছে সেইসব কায়দা কানুন। ও-দিকে বনে বনে তখন পশুদের রাজত্ব। হাজার রকমের প্রাণী, অসংখ্য পাখ-পাখালি। বেশ শান্তিতেই কাটছিল বনের পাখি আর প্রাণীদের দিনগুলো। কিন্তু একদিন হলো কী, একটা বন থেকে তাড়া খেয়ে মস্ত একটা হাতি এসে ঢুকে পড়লো অন্য একটা বনে। হাতিটার সে-কী বিশাল শরীর। পাগুলো বটপাকুড় গাছের মতো মোটা। শুঁড় এতটাই লম্বা যে আকাশের গায়ে গিয়ে বুঝি ঠেকবে। তার গায়েও অসীম জোর। এই শরীর আর শক্তি নিয়েই তার যত অহংকার। মেজাজটাও দারুণ তিরিক্ষি।

তো যেই-না হাতিটার ঐ বনে ঢোকা, অমনি শুরু হয়ে গেল তোলপাড়। নতুন অতিথি এসেছে, সবাই স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু ঐ দুষ্টু হাতিটার সে-কী তুলকালাম কাণ্ড। খুব জোরে গলা ফাটিয়ে দিল প্রচণ্ড একটা হুঙ্কার। থরথর করে কেঁপে উঠল সমস্ত বন। গাছে গাছে পরম নিশ্চিন্তে বসে ছিল যে-সব পাখি, তারা ভয়ে ডানা ঝাপটাতে শুরু করল। মাটির তলায় লুকিয়ে ছিল যে ইঁদুর, গুবরে পোকার দল, বুঝতে চাইল কী এমন ঘটল যে এমন করে কেঁপে উঠল মেদিনী?

হাতিটা এমন ভাব করতে শুরু করল, সেই বুঝি বনের রাজা। গুরুগম্ভীর ভারিক্কি চালের কেশর দোলানো অমিত শক্তিধর সিংহ। সেও হাতিটার কাছে আসতে ভয় পায়। হালুম বাঘ মামা তো সব সময় থাবা উঁচিয়ে চলে। কী দ্রুত আর ক্ষিপ্র তার চলা। সেও হাতিটার ধারে-কাছে ঘেঁষতে চায় না। বনের সব্বাই ভয়ে তটস্থ, শঙ্কিত। কখন জানি কী হয়। কাকে শুঁড় দিয়ে শূন্যে তুলে আছড়ে মারে।

একবার তো কী জানি কী হয়েছে। নিরীহ একটা হরিণকে শুঁড়ে জড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। আরেক বার ছোট্ট একটা পিঁপড়ে। চোখে পড়ে কি পড়ে না, বিন্দুসদৃশ তার চলা। তাকেও পায়ের তলায় পিসে মেরে ফেলল। সেই থেকে বনের কোনো প্রাণী হাতিটার ছায়াও মাড়াত না। দেখলেই সমীহ করে পথ ছেড়ে দিত। দিনে দিনে হাতিটা হয়ে উঠল আরও দুর্বিনীত, আরও অহংকারী। বনের কারো মনে শান্তি নেই, চোখে নেই ঘুম। কখন জানি কার উপর নেমে আসে অত্যাচারের খড়্গ।

কিন্তু এভাবে কি দিন যায়? এক সন্ধ্যায় বনের সব প্রাণী এসে জড়ো হলো সিংহের গুহায়। এর একটা বিহিত চাই, সবার মুখে এক কথা। বাঘ, ভালুক, বানর, হরিণ, বনবিড়াল, শিয়াল সবাই শলা-পরামর্শ করতে বসলো, মাঝখানে সিংহ বাহাদুর। সিংহ ফিসফিসিয়ে বলল, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান কে? সবাই নিচু স্বরে বলল – শেয়াল, শেয়াল। ঠিক ঠিক – সিংহ বাহাদুর আবার ফিসফিসিয়ে সায় দিল। শেয়ালের উপরেই তাই দায়িত্ব পড়ল। যা করার সে-ই করবে।

দিন আসে, দিন যায়। একদিন শেয়াল ভয়ে ভয়ে হাজির হলো হাতির আস্তানায়। লেজ গুটিয়ে, হাঁটু মুড়ে হাতিকে লম্বা একটা সালাম দিয়ে বলল, আপনিই তো বনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী। আপনিই আমাদের রাজা, সবাই একথা জানে। ঐ দেখুন, নদীর ওপারে সবাই উদগ্রীব হয়ে বসে আছে। আপনাকে রাজা হিসেবে বরণ করে নিতে চায়।

হাতি তো শেয়ালের কথা শুনে মহা খুশি। মাটিতে থপ্ করে পা ঠুকে বলল, আচ্ছা চল। নদীর পারে এসে শেয়াল বলল, এই আমি নদী সাঁতরে পার হচ্ছি। আপনিও আসুন,। হাতির একটু শঙ্কা হলো, পারব তো। শেয়াল বলল, ভয় কী, এই দেখুন না আমি কী অবলীলায় পার হয়ে যাচ্ছি। এই বলে শেয়াল নদীতে দিল ঝাঁপ। হাতি ভাবল, ঐ পুঁচকে শেয়াল যদি নদী পার হতে পারে, তাহলে আমার মতো অমিত শক্তিধর হাতি পারবে না কেন? সেও নদীর দিকে দু-পা বাড়িয়ে দিল।

কিন্তু হাতি বলে কথা। কী ভারী আর মস্ত তার শরীর। নদীর তীর ছিল বালুকাময়। ওই অংশটুকু পেরিয়ে যেই না হাতিটা নদীর পানিতে পা দিয়েছে, অমনি তার ভারী শরীর একটু একটু করে তলিয়ে যেতে থাকল। আসলে জায়গাটা ছিল একটা চোরাবালি। এর ওপরটায় মাটি বা বালি আছে বলে মনে হলেও এর তলায় লুকিয়ে থাকে গর্ত। হাতি সেই গর্তে

তলিয়ে যেতে যেতে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতে থাকল। বলল, শেয়াল ভায়া, আমাকে বাঁচাও। শেয়াল ততক্ষণে নদী পার হয়ে তীরে উঠে এসেছে। বনের সমস্ত প্রাণী তার পেছনে এসে দাঁড়াল। শেয়াল বলল, তোমাকে বাঁচাব আমরা? এতদিন তোমার অত্যাচারে আমরা কেউ বনে শান্তিতে একবেলা ঘুমুতেও পারিনি। তাই তোমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যেই তো নদীতে নিয়ে এসেছি। বনের যত প্রাণী ছিল, সবাই শেয়ালের কথার প্রতিধ্বনি করে সমস্বরে বলে উঠল :

ঠিক বলেছ শেয়াল ভায়া
আর দেখব না হাতির ছায়া
আমরা এখন মুক্ত স্বাধীন
নাচছি সবাই তা-ধিন তা-ধিন।

(হিতোপদেশ অবলম্বনে)

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই ও নতুন বাক্য তৈরি করি।

দিগন্ত – প্রান্তরের শেষে আকাশ যেখানে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে বলে মনে হয়। দিগন্তের ওপারে কী আছে কেউ জানে না।

অহংকার – নিজে অনেক বড় কেউ – এরকম মনে করা। অহংকার পতনের মূল।

তিরিক্ষি – খারাপ মেজাজ। মেজাজ তিরিক্ষি বলে তার কাছে কেউ ঘেঁষতে চায় না।

তুলকালাম কাণ্ড – এলাহি কাণ্ড। নিজের কলমটা খুঁজে না পেয়ে সে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে।

হুঙ্কার – চিৎকার। বনের সিংহ হুঙ্কার দিলে মানুষের মনে ভয় জাগে।

মেদিনী – ভূপৃষ্ঠ। বিদ্যুৎ চমকালে মেদিনীও কেঁপে ওঠে বলে মনে হতে পারে।

তটস্থ – ব্যতিব্যস্ত । কী হয়েছে, এত তটস্থ হয়ে আছ কেন?

শঙ্কিত – ভীত। তুমি এত শঙ্কিত কেন? কী হয়েছে?

কিন্দুসদৃশ – কিন্দুর মতো ছোট, খুব ছোট। কিন্দুসদৃশ একটা পিঁপড়ে, কিন্তু সে কামড় দিলেও যন্ত্রণা হয়।

শক্তিধর – শক্তি আছে যার। বাঘ এক ধরনের শক্তিধর প্রাণী।

দুর্বিনীত – বিনীত বা ভদ্র নয় যে। শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্বিনীত আচরণ করা ভালো নয়।

আস্তানা – বসবাসের জায়গা। সিংহের আস্তানায় বাঘ বাস করে না।

উদগ্রীব – প্রতিমুহূর্ত অপেক্ষা করা। তোমার জন্যে আমরা কখন থেকে উদগ্রীব হয়ে বসে আছি।

অবলীলায় – খুব সহজে। অবলীলায় সে যে কোনো কাজ করতে পারে।

সমস্বরে – একসঙ্গে শব্দ করা বা কথা বলা। সমস্বরে গলা মিলিয়ে জাতীয় সংগীত গাইতে হয়।

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) অনেক দিন আগে মানুষ কী শিখছিল ?

(খ) হাতিটা দেখতে কেমন ছিল ?

(গ) হাতিটা বনে ঢুকে কী ধরনের আচরণ করেছিল ?

(ঘ) হাতির আস্তানায় ঢুকে শেয়াল হাতিটাকে কীভাবে, কী বলেছিল ?

(ঙ) অহংকারী ও অত্যাচারীর পরিণাম শেষ পর্যন্ত কী হয় ?

৩. যে কোনো একটা প্রাণী সম্পর্কে বলি এবং পাঁচ বাক্যের একটা অনুচ্ছেদ রচনা করি।

৪. বিপরীত শব্দ লিখি।

সুন্দর – কুৎসিত

সভ্য –

শান্তি –

অহংকার –

দুর্বিনীত –

বুদ্ধিমান –

ভয় –

শক্তিশালী –

ধ্বনি –

স্বাধীন –

৫. কর্ম-অনুশীলন।

একটি গল্প লেখার চেষ্টা করি। প্রথমে শিক্ষক-শিক্ষিকার সহায়তায় ২/৩টি সাদা কাগজ নিই। সেগুলোকে একটি ভাঁজ করে নোটবুকের মতো তৈরি করি। এখন প্রত্যেকটি কাগজের এক পাশে নিচের দিকের অর্ধেক থেকে গল্প লেখা শুরু করি। আর উপরের অর্ধেকে নিজের খুশিমতো ছবি আঁকি। লেখা শেষে উপরে একটা কভার পৃষ্ঠা যোগ করি। সে-পৃষ্ঠায় গল্পের একটা নাম দিই ও লিখি, নিজের নাম লিখি এবং ইচ্ছামতো ছবি আঁকি। এভাবে নিজের লেখা একটি গল্পের বই তৈরি করি।

শব্দদূষণ

সুকুমার বড়ুয়া

গরু ডাকে হাঁস ডাকে– ডাকে কবুতর
গাছে ডাকে শত পাখি সারা দিনভর।
মোরগের ডাক শুনি প্রতিদিন ভোরে
নিশিরাতে কুকুরের দল ডাকে জোরে।
দোয়েল চড়ুই মিলে কিচির মিচির
গান শুনি ঘুঘু আর টুনটুনিটির।

শহরের পাতি কাক ডাকে ঝাঁকে ঝাঁকে
ঘুম দেয়া মুশকিল হর্নের হাঁকে।
সিডি চলে, টিভি চলে, বাজে টেলিফোন
দরজায় বেল বাজে, কান পেতে শোন।
গলিপথে ফেরিঅলা হাঁকে আর হাঁটে
ছোটদের হইচই ইশকুল মাঠে।

পল্লির সেই সুরে ভরে যায় মন
শহুরে জীবন জ্বালা– শব্দদূষণ।

পাঠ শিখি

১. নিচের শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই ও ব্যবহার শিখি।

নিশিরাত – গভীর রাত্রি। মাঝ রাত। নিশিরাতে চেঁচামেচি করো না, সবাই ঘুমুচ্ছে।

কিচির মিচির – পাখির ডাকাডাকির আওয়াজ। ভোর বেলাতেই পাখির কিচির মিচির শুনতে শুনতে আমার ঘুম ভাঙে।

ফেরিঅলা – রাস্তায় বা বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে যারা জিনিসপত্র বিক্রি করে। ফেরিঅলা হাঁক দিচ্ছে – থালাবাসন চাই?

শব্দদূষণ – অত্যন্ত কোলাহলে শব্দদূষণ ঘটে। শব্দদূষণে আমাদের কানে শোনার ক্ষমতা কমে যায়।

২. নিচের কথাটি বুঝে নিই।

পল্লির সেই সুরে ভরে যায় মন – শহুরে জীবন জ্বালা– শব্দদূষণ।

শহরে শান্তিতে বসবাস করা মুশকিল। কারণ হাজার রকমের শব্দ কান ঝালাপালা করে দেয়। গ্রামে শব্দ অনেক কম, তার ফলে মনের শান্তি বজায় থাকে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।

(ক) কবিতায় কোন কোন পশু ও পাখির কথা বলা হয়েছে ?

(খ) শহরে ঘুমানোয় অসুবিধা কেন ?

(গ) কুকুরের ডাক আর পাখির ডাকের মধ্যে কোনটি তোমার ভালো লাগে ? কেন ?

(ঘ) গ্রামের মানুষ কোন পাখির ডাক শুনে ঘুম থেকে ওঠে ?

৪. নিচের কোন প্রাণী কেমন করে ডাকে তা অভিনয় করে দেখাই।

গরু	–	হাম্বা
হাঁস	–	
কবুতর	–	
মোরগ	–	
কুকুর	–	
চড়ুই	–	
কাক	–	
বিড়াল	–	
ছাগল	–	
কোকিল	–	

৬. শহুরে জীবনের সাথে গ্রামের জীবনের তুলনা করি ও লিখি।

৭. কবিতাটি সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করি।

কবি পরিচিতি
সুকুমার বড়ুয়া

সুকুমার বড়ুয়া বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ছড়াকার। তিনি ১৯৩৮ সালের ৫ই জানুয়ারি চট্টগ্রামের রাউজান থানার বিনাজুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ : 'পাগলা ঘোড়া', 'ভিজে বেড়াল', 'চন্দনা রঞ্জনার ছড়া', 'এলোপাতাড়ি', 'নানা রঙের দিন', 'চিচিংফাঁক' প্রভৃতি। তিনি শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন।

বীরের রক্তে প্রতিষ্ঠিত দেশ

দুরন্ত এক কিশোর। নাম নূর মোহাম্মদ শেখ। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। নাটক, থিয়েটার আর গানের প্রতি তার প্রবল অনুরাগ। কিন্তু ওই কিশোর বয়সে হঠাৎ করে তার বাবা-মা মারা গেলেন। বদলে গেল তার জীবন। যোগ দিলেন ইপিআর, অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসে। সেখানে তাঁর জীবন চলছিল ভালোই। কিন্তু একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ আবার বদলে দিল সবকিছু। অন্যান্য বাঙালির মতো তিনিও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেন।

সময়টা ১৯৭১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর। যশোরের পাকিস্তানি ঘুঁটিপুর ক্যাম্প। ঐ ক্যাম্পে অবস্থান করছিল পাকিস্তানি সেনা আর কিছু রাজাকার। একটু দূরে গোয়ালহাটি গ্রামে টহল দিচ্ছিলেন পাঁচ মুক্তিযোদ্ধা। এদেরই নেতৃত্বে ছিলেন ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ। পাকিস্তানি সেনারা টের পেয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান। রাজাকারদের সহায়তায় তিন দিক থেকে তারা তাদের ঘিরে ফেলে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা দমবার পাত্র নন। এই দলেই ছিলেন অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা নান্নু মিয়া। তিনি একটা হালকা মেশিন গান থেকে গুলি ছুঁড়ছিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষের একটা গুলি হঠাৎ এসে লাগে তাঁর গায়ে। নূর মোহাম্মদ তাকে এক হাত দিয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে অন্য হাত দিয়ে গুলি চালাতে থাকলেন। কৌশল হিসেবে বার বার নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকলেন। উদ্দেশ্য – একজন নন, অনেক মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করছেন – শত্রুদের এরকম একটা ধারণা দেওয়া। সংখ্যায় কম বলে সহযোদ্ধাদের নির্দেশ দিলেন পিছিয়ে গিয়ে অবস্থান নিতে।

কিন্তু হঠাৎ মর্টারের একটা গোলা এসে লাগল তাঁর পায়ে। গোলার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল তাঁর পা। তিনি বুঝতে পারলেন মৃত্যু আসন্ন। সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধা সিপাহি মোস্তফাকে বললেন নান্নু মিয়াকে নিয়ে আস্তে আস্তে পেছনে সরে যেতে। মোস্তফা সেটাই করলেন, আর তিনি মোস্তফার রাইফেল দিয়ে যতক্ষণ সম্ভব গুলি চালাতে চালাতে শহিদ হলেন। বাংলার রক্তরঞ্জিত মাটিতে পড়ে রইল তার নিথর দেহ। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে নূর মোহাম্মদ শেখ সেদিন এভাবেই রক্ষা করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন। অসীম সাহসী এই বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধার জন্ম ১৯৩৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে নড়াইলের মহেশখালি গ্রামে।

নূর মোহাম্মদ শেখ

মুক্তিযুদ্ধে এরকম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন আরও অনেকেই। এঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়েই স্বাধীনতা অর্জন করেছি আমরা। এরকমই আরেক যোদ্ধা বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহি মুন্সী আবদুর রউফ। রউফ ১৯৪৩ সালের ১লা মে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারি থানার সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় দারুণ দুরন্ত ছিলেন তিনি। মাঠে-প্রান্তরে নদীতে-খালে সাঁতার কেটে আর ঘুরে বেড়িয়ে দিন কাটত তার। তিনিও ইপিআর বাহিনীতে যোগ দেন। মেশিন-চালক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকদের মতো তিনিও মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তুমুল এক যুদ্ধে বীরের মতো শহিদ হন তিনি।

মুন্সী আবদুর রউফ

দিনটি ছিল একাত্তরের ৮ই এপ্রিল। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি নৌসেনাদের উপর আক্রমণ করার জন্যে মহালছড়ির কাছে বুড়িঘাট এলাকার চিংড়ি খালের দুই পাশে অবস্থান গ্রহণ করেন।

পাকিস্তানি সৈন্যরা সাতটি স্পিডবোট আর দুটি মোটর লঞ্চ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে। ঐ আক্রমণে হালকা অস্ত্রের অধিকারী স্বল্প সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু ছিল অবধারিত। তবু মুক্তিযোদ্ধারা রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যাননি। আবদুর রউফ নিজেই দায়িত্ব নিলেন নিজের জীবন দিয়ে সবাইকে রক্ষা করার। হালকা একটা মেশিনগান হাতে তুলে নিয়ে গুলি ছুঁড়ে শত্রুসেনাদের রুখে দিতে থাকলেন। সহযোদ্ধাদের বললেন নিরাপদে সরে যেতে। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত আক্রমণে পাকিস্তানিদের সাতটি স্পিডবোটই ডুবে গেল। অনেকে মারা গেল। বাকি লঞ্চ দুটো থেকে গোলাবর্ষণ আর গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তারা পিছু হটতে থাকল। এরকম মুহূর্তেই হঠাৎ একটা গোলা এসে পড়ল তাঁর উপর, তিনি শহিদ হলেন। বীরের পবিত্র রক্তস্রোতে রঞ্জিত মাটি, অর্থাৎ রাঙামাটির বোর্ড বাজারে অন্তিম শয়ানে শায়িত আছেন বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ।

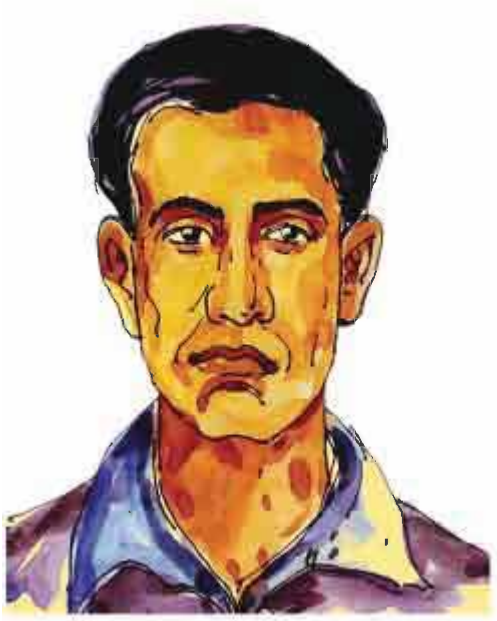
রুহুল আমিন

একাত্তরে পাকিস্তানি সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে কতভাবেই-না যুদ্ধ করতে হয়েছিল আমাদের। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মুক্তিযোদ্ধারা সর্বাত্মক যুদ্ধে পরাভূত করছিল শত্রু সেনাদের। এই যুদ্ধে জয়ী বাহিনী হিসেবে মুক্তিযোদ্ধারা বয়ে এনেছেন অসীম গৌরব। বীরের জাতি হিসেবে বিশ্বসভায় আমরা স্থান করে নিয়েছি। এরকমই এক যুদ্ধে শহিদ হন বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

ডিসেম্বরের ১০ তারিখ। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হতে আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। মুক্তিযোদ্ধাদের নৌজাহাজ বিএনএস পলাশ আর পদ্মা মংলা বন্দর দখল করে নিয়েছে। পরবর্তী লক্ষ্য খুলনা দখল করা। খুলনার দিকে ধেয়ে আসছে তারা। ভৈরব নদী বেয়ে জাহাজ দুটি খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছাকাছি আসতেই একটা বোমারু বিমান থেকে জাহাজ দুটির উপর বোমা এসে পড়ে। রুহুল আমিন বিএনএস পলাশ থেকে ঝাঁপ দিয়ে নদী সাঁতরে পাড়ে উঠলেন। বোমার আঘাত থেকে তিনি রক্ষা পেলেন, কিন্তু রাজাকারদের হাতে মৃত্যু হলো তাঁর। নদীতীরে তখন রাজাকার আলবদররা অবস্থান করছিল। তারাই তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তিনি শহিদ হন। খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা।

আমার বাংলা বই

বাংলাদেশ আজ মুক্ত। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করি। বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই অর্জন খুব সহজে ঘটেনি। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা দেশমাতৃকাকে মুক্ত করেছি। বীরের পুত-পবিত্র রক্তস্রোত আর মাতার অশ্রুধারায় স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বাংলাদেশের।

পাঠশিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই ও ব্যবহার শিখি।

অনুরাগ – স্নেহ, আদর, আকর্ষণ
টহল – পাহারা দেওয়া।
আসন্ন – নিকটবর্তী।
রক্তরঞ্জিত – রক্ত দিয়ে লাল করা হয়েছে এমন।
নিথর – স্থির, শান্ত।
রণক্ষেত্র – যুদ্ধের মাঠ, যেখানে যুদ্ধ হয়।
অন্তরীক্ষে – আকাশ, মহাশূন্য।
শয়ান – শুয়ে আছে এমন।

২. ব্যাখ্যা করি।

বীরের পুত-পবিত্র রক্তস্রোত আর মাতার অশ্রুধারায় স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বাংলাদেশের।

৩. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করি।

(ক) ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখের দলে ছিলেন অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ———————— ।

(খ) বাংলার ———————— মাটিতে পড়ে রইল নূর মোহাম্মদ শেখের নিথর দেহ।

(গ) রউফ ———————— সালের ———— মে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারি থানার সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

(ঘ) বীরশ্রেষ্ঠ ———————— জন্ম ১৯৩৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি নড়াইলের মহেশখালি গ্রামে।

৪. বিপরীত শব্দ লিখি।

দুরন্ত –
অসীম –
স্বাধীনতা –
সুনাম –
বীর –
জয় –
জীবন –
পরবর্তী –

৫. আমাদের জাতীয় দিবসগুলোর পাশে তারিখবাচক শব্দ লিখি।

(ক) শহিদ দিবস –
(খ) স্বাধীনতা দিবস –
(গ) বাংলা নববর্ষ –
(ঘ) শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস –
(ঙ) বিজয় দিবস –

৬. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) নূর মোহাম্মদ শেখের কী ইচ্ছা ছিল ?
(খ) নূর মোহাম্মদ শেখের জীবন কীভাবে বদলে গেল ?
(গ) নূর মোহাম্মদ শেখ কীভাবে শহিদ হলেন ?
(ঘ) সিপাহি মুন্সী আবদুর রউফের যুদ্ধের ঘটনাটা লিখি।
(ঙ) কোথায় সিপাহি মুন্সী আবদুর রউফ অন্তিম শয়ানে শায়িত আছেন ?
(চ) রুহুল আমিন কাদের হাতে শহিদ হয়েছিলেন ? কীভাবে ?

৭. বীরশ্রেষ্ঠদের সম্পর্কে রচনা লিখি।

(ক) বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ
(খ) বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহি মুন্সী আবদুর রউফ
(গ) বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন

৮. কর্ম-অনুশীলন।

নিচের লেখা বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপনের জন্য গান, কবিতা, ছড়া, বক্তৃতা, অভিনয় ও ছবি আঁকা বিষয় নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করে আলাদা আলাদা পরিকল্পনা করি।

শিক্ষক-শিক্ষিকার সহায়তায় ঐ দিবসগুলো পালনের জন্য প্রস্তুতি নিই।
– মহান স্বাধীনতা দিবস
– বিজয় দিবস
– আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
– জাতীয় শিশু দিবস
–
–

বই

হুমায়ুন আজাদ

বইয়ের পাতায় প্রদীপ জ্বলে
বইয়ের পাতা স্বপ্ন বলে।

যে-বই জুড়ে সূর্য ওঠে
পাতায় পাতায় গোলাপ ফোটে
সে-বই তুমি পড়বে।

যে-বই জ্বালে ভিন্ন আলো
তোমাকে শেখায় বাসতে ভালো
সে-বই তুমি পড়বে।

যে-বই তোমায় দেখায় ভয়
সেগুলো কোনো বই-ই নয়
সে-বই তুমি পড়বে না।

যে-বই তোমায় অন্ধ করে
যে-বই তোমায় বন্ধ করে
সে-বই তুমি ধরবে না।

বইয়ের পাতায় প্রদীপ জ্বলে
বইয়ের পাতা স্বপ্ন বলে।

পাঠ শিখি

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

কোনো কোনো বই আছে, যেগুলো সুন্দর ও শুভ চিন্তা-ভাবনার কথা বলে। আমাদের মনকে সুন্দর স্বপ্নে ভরিয়ে তোলে। আমাদের মনে জ্বালিয়ে দেয় শুভ-ভাবনার প্রদীপ। আমাদের মনের ভিতরের স্বার্থপরতা ও মন্দ চিন্তাকে দূর করতে সাহায্য করে। আমাদের ভালো মানুষ হয়ে ওঠার পথ দেখায়।

আবার, এমন কিছু বইও আছে পৃথিবীতে, যেগুলো মনের ক্ষুদ্রতা দূর তো করেই না, বরং মনকে আরো স্বার্থপর করে তোলে। মনকে করে তোলে ঈর্ষা ও হিংসায় জরজর। সেসব বই পড়লে মন আলোকিত হয় না, সুন্দর মানুষ হয়ে উঠবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠবার জন্য আমরা তাই সুন্দর ভাবনা চিন্তায় ভরা বইগুলো পড়ব।

২. শব্দগুলোর অর্থ শিখি ও ব্যবহার জেনে নিই।

প্রদীপ – বাতি, দীপ। প্রদীপের আলো চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না, চোখ জুড়িয়ে দেয়।
স্বপ্ন – স্বপন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রোজ আমি অনেক স্বপ্ন দেখি।
ভিন্ন – আলাদা, পৃথক, অন্য। ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে।
অন্ধ – অন্ধ, চোখে দেখতে পায় না এমন। অন্ধ লোককে রাস্তা পার হতে সাহায্য করব।
বন্ধ – আটক, অচল। বন্ধ জানালার বাইরেই আছে নীল আকাশ।

৩. নিচের কথাটি বুঝে নিই।

(ক) বইয়ের পাতায় প্রদীপ জ্বলে বইয়ের পাতা স্বপ্ন বলে। – বইয়ের পাতা অনেক নতুন চিন্তা, নতুন কথা আমাদের সামনে তুলে ধরে। বইয়ের সেসব কথা পড়ে আমরা নতুন করে ভাবতে শিখি, স্বপ্ন দেখতে শিখি। আমরা হয়ে উঠতে পারি নতুন মানুষ।

(খ) যে-বই তোমায় অন্ধ করে
যে-বই তোমায় বন্ধ করে
সে-বই তুমি ধরবে না।

– কিছু কিছু বই আছে, যেগুলো সুন্দর ও ভালো কথা বলে না, বরং বলতে থাকে এমন সব মন্দ চিন্তা-ভাবনার কথা, যা পড়লে আমাদের মন সংকীর্ণ ও স্বার্থপর হয়ে যায়। সেসব বই পড়ে আমরা আমাদের মনকে কখনো অন্ধকারে ভরিয়ে তুলব না।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।

(ক) কোন ধরনের বই পড়া উচিত ? কেন ?
(খ) কোন বই পড়া উচিত নয়? কেন পড়া উচিত নয় ?
(গ) 'কাল যেখানে আঁধার ছিল আজ সেখানে আলো'–কথাটি ব্যাখ্যা করি।

৫. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও না দেখে লিখি।

৬. আমার পড়া প্রিয় বই সম্পর্কে একটি রচনা লিখি।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

পাঠ্যবইয়ের বাইরে আমি যেসব ছড়া ও কবিতা পড়েছি তার একটি তালিকা তৈরি করে শিক্ষকের নিকট জমা দিই। পরে, তার মধ্য থেকে একটি / দুটি ছড়া বা কবিতা আবৃত্তি করি।

কবি পরিচিতি
হুমায়ুন আজাদ

হুমায়ুন আজাদ একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক ও ভাষাবিজ্ঞানী। ১৯৪৭ সালের ২৮শে এপ্রিল বিক্রমপুরের রাঢ়িখালে তাঁর জন্ম।তিনি চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ : 'অলৌকিক ইস্টিমার', 'জ্বলো চিতাবাঘ', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না', 'কত নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী', 'লাল নীল দীপাবলি বা বাংলা সাহিত্যের জীবনী'। ২০০৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শখের মৃৎশিল্প

গ্রামের নাম আনন্দপুর। মামার বাড়ি। কথায় আছে মামার বাড়ি রসের হাঁড়ি। আসলেই তাই। পড়া নেই, বাধা নেই, যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াও, যা খুশি খাও। এই তো মামার বাড়ি। গেল বছর পয়লা বৈশাখের ছুটিতে গিয়েছিলাম আনন্দপুর। সেখানে পয়লা বৈশাখে মেলা বসে। মামা বললেন, তোমাদের মেলা দেখতে নিয়ে যাব।

আমরা ছিলাম চার জন – আমি, মামাতো বোন বৃষ্টি, সোহানা আর ছোটভাই তাজিন। মেলা বসে সকালে। আমরা একটু দেরি করেই গেলাম। মামা বেশ মজার মানুষ। কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ। তাতে থাকে ছবি আঁকার নানান জিনিস, থাকে একটা বাঁশি। পড়েন ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটে। মেলার একটু কাছে পৌঁছতেই শুনতে পেলাম নাগরদোলার ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ। দেখলাম বাঁশের তৈরি কুলো, ডালা, ঝুড়ি, চালুন, মাছ

ধরার চাঁই, খালই আরও কত কী ? বসেছে বাঙি, তরমুজ, মুড়ি-মুড়কি, জিলাপি আর বাতাসার দোকান সারি সারি। আরেকটু এগুতেই দেখতে পেলাম কত রঙের, কত বর্ণের বিচিত্র সব মাটির হাঁড়ি – ফুল, পাতা, মাছের ছবি আঁকা সেসবে। রয়েছে মাটির ঘোড়া, হাতি, ষাঁড় আর নানা আকারের মাটির পুতুল। আমার চোখ পড়ল কাজ করা অপূর্ব সুন্দর মাটির হাঁড়ির দিকে। মামাকে জিজ্ঞেস করলাম – এটা কিসের হাঁড়ি?

মামা বললেন, এটা শখের হাঁড়ি। শখ করে পছন্দের জিনিস এই সুন্দর হাঁড়িতে রাখা হয়, তাই এর নাম শখের হাঁড়ি। তা ছাড়া শখের যে কোনো জিনিসই তো সুন্দর।

আমরা দুটি শখের হাঁড়ি কিনলাম। আবাক হলাম, পুতুলের পাশেই ঘোলা চোখে চেয়ে আছে এক চকচকে রুপালি ইলিশ। পদ্মার তাজা ইলিশের মতোই। তেমনি সাদা আঁশ, লাল ঠোঁট। আমরা একটা মাটির ইলিশও কিনলাম। মামা বললেন, ওই যে পুতুলগুলো দেখছ ওগুলো টেপা পুতুল। নরম এঁটেল মাটি টিপে টিপে এসব পুতুল বানানো হয় বলে এগুলোর নাম টেপা পুতুল। বউ-জামাই, কৃষক, নথপরা ছোট্ট মেয়ে – নানা রকমের মাটির পুতুল। মেলার এক প্রান্তে বড় জায়গা জুড়ে এসব মাটির পুতুলের দোকান। মামা বললেন, এগুলো হচ্ছে মাটির শিল্পকলা। শিল্পকলা কথাটি বেশ ভারী ভারী মনে হলো। মামা বুঝিয়ে বললেন – যখন কোনো কিছু সুন্দর করে আঁকি, সুন্দর করে বানাই, সুন্দর করে গাই, তখন তা হয় শিল্প। শিল্পের এ কাজকে বলে শিল্পকলা। আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে মাটির শিল্প। এ দেশের কুমোর সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে তৈরি করে আসছে মাটির কলস, হাঁড়ি, সরা, বাসন-কোসন, পেয়ালা, সুরাই, মটকা, জালা, পিঠে তৈরির নানা ছাঁচ, আরও কত কী ! নিত্য দিনের দরকারি এসব জিনিসের সঙ্গে তারা তৈরি করে আসছে উৎসব-পার্বণের জন্য নানা রঙের বাহারি মাটির জিনিস, তৈজসপত্র।

মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে আমরা বলি মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। তবে সব মাটি দিয়ে এ কাজ হয় না। দরকার পরিষ্কার এঁটেল মাটি। এ ধরনের মাটি বেশ আঠালো। দোঁআশ মাটি তেমন আঠালো নয়, আর বেলে মাটি তো ঝরঝরে – তাই এগুলো দিয়ে মাটির শিল্প হয় না। এঁটেল মাটি হলেই যে তা দিয়ে শিল্পের কাজ করা যাবে তাও নয়। এর জন্য অনেক যত্ন আর শ্রম দরকার। দরকার হাতের নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞান। কুমোরদের কাছে এসব খুব সহজ। কারণ তারা বংশ পরম্পরায় এ কাজ করে আসছে। আবার এ কাজের জন্য প্রয়োজন কিছু ছোটখাটো যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম। সবকিছুর আগে যেটা দরকার তা হলো একটা কাঠের চাকা। এই চাকায় নরম মাটির তাল লাগিয়ে লাগিয়ে নানা আকারের মাটির পাত্র ও নানা জিনিস তৈরি করে কুমোররা।

মেলা থেকে সেদিন আমরা অনেক টেপা পুতুল, ঘোড়া, হাতি, ছোট কলস কিনলাম। মামা বললেন, এই যে এত সুন্দর নকশা দেখছ, রং দেখছ এ সবই গ্রামের শিল্পীদের তৈরি। নকশাগুলো তারা মন থেকে আঁকে। আর রং তৈরি করে শিম, সেগুনের রস, কাঁঠাল গাছের

বাকল থেকে। তবে আজকাল বাজার থেকে কেনা রঙও লাগানো হয়। মেলা থেকে কদমা, বাতাসা, মুড়কি আর খই কিনে শখের হাঁড়ি ভর্তি করে আমরা ফিরলাম।

খুব মজা হলো। মামা বললেন, তোমাদের কাল কুমোর পাড়ায় নিয়ে যাব। পরদিন আমরা দেখতে গেলাম কুমোর পাড়া । আনন্দপুর গ্রামের উত্তর দিকে আট দশ ঘর বসতবাড়ি। এই নিয়ে কুমোর পাড়া । এখানে সবাই ব্যস্ত । কেউ মাটির তাল চাক করে সাজিয়ে রাখছে। কেউ-বা কাঠের চাকায় মাটি লাগিয়ে নানা আকারের পাত্র বানাচ্ছে। কেউ-বা এগুলো সার সার করে শুকোতে দিচ্ছে রোদে। পাশেই রয়েছে মাটির জিনিস পোড়ানোর চুলা। উঁচু ছোট্ট ঢিবির মতো এই চুলা। মাটি পোড়ার গন্ধ পাচ্ছি। আর ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এ কাজ করছে।

মামা বললেন – হাঁড়ি কলসি ছাড়াও আমাদের দেশে এক সময় গড়ে উঠেছিল সুন্দর পোড়ামাটির ফলকের কাজ। এর অন্য নাম টেরাকোটা। বাংলার অনেক পুরনো শিল্প এই টেরাকোটা। নকশা করা মাটির ফলক ইটের মতো পুড়িয়ে তৈরি করা হতো এই টেরাকোটা। শালবন বিহার, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর বৌদ্ধ স্তূপ ও দিনাজপুরের কান্তজির মন্দিরে এই টেরাকোটার কাজ রয়েছে। তা ছাড়া বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদে পাওয়া গেছে পোড়ামাটির অপূর্ব সুন্দর কাজ। মাটির ফলকে ছবি এঁকে শুকিয়ে পোড়ানোর পর এগুলো এমন সুন্দর হয়ে ওঠে। ছোট ছোট ফলককে পাশাপাশি জোড়া দিয়ে বড় করা যায়। পোড়ামাটির এই ফলক বাংলার প্রাচীন মৃৎশিল্প। মামা বললেন, টেরাকোটা বা পোড়ামাটির এসব কাজ এ দেশে শুরু হয়েছে হাজার বছর আগে।

এগুলো আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের গর্ব। এ দেশের মানুষের মন যে শিল্পীর মন, এগুলো তার পরিচয় বহন করে। তোমরা হয়তো জানো, কিছুকাল আগে নরসিংদীর উয়ারী বটেশ্বরে পাওয়া গেছে প্রায় হাজার বছর আগের সভ্যতার নিদর্শন। মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে নানা ধরনের সুন্দর মাটির পাত্র আর ফলক। তোমাদের এই বইয়ের 'মাটির নিচে যে শহর' গল্পটি পড়ে এ সম্পর্কে আরও জানতে পারবে।

আজকাল কি পোড়ামাটির এই শিল্পচর্চা হয় না ? মামার কাছে জানতে চাইলাম আমরা।

মামা বললেন, বেশ ভালো কথা জিজ্ঞেস করেছ তোমরা। হ্যাঁ, আজকাল ওরকম টেরাকোটা হচ্ছে না বটে, তবে পোড়ামাটির নকশার কদর বেড়েছে। বড় বড় সরকারি বেসরকারি ভবনে আজকাল সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য নানা রকম নকশা করা মাটির ফলক ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের দেশের কুমোররা এসব তৈরি করছে। বললাম, আমরা এসব পোড়ামাটির কাজ দেখতে চাই। মামা বললেন, সুযোগ মতো এক সময় তোমাদের শালবন বিহারে নিয়ে যাব।

(২০১২ শিক্ষাবর্ষের পঞ্চম শ্রেণির আমার বাংলা বই থেকে গৃহীত)

পাঠ শিখি

১. রচনার মূলভাব জেনে নিই।

বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যায় মাটির শিল্পে। এটা এ দেশের নিজস্ব শিল্প। বৈশাখী মেলায় ও নানা পার্বণে যেসব মেলা বসে, সেসব মেলায় বিক্রি হয় মাটির তৈরি নানারকম পুতুল, নকশা করা হাঁড়ি, মাটির ফল, তৈজসপত্র। গ্রামের কুমোররা নিপুণভাবে এসব তৈরি করে। প্রাচীন কাল থেকে এ দেশে মৃৎশিল্পের চর্চা হচ্ছে। ময়নামতির শালবন বিহার, বগুড়ার মহাস্থানগড়, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদে দেখা যায় পোড়া মাটির ফলক বা টেরাকোটার নিদর্শন। তাই মাটির শিল্প আমাদের ঐতিহ্য ও গর্বের বিষয়।

২. শব্দার্থগুলো জেনে নিই।

শখ – মনের ইচ্ছা, রুচি।

টেপা পুতুল – কুমোররা নরম এঁটেল মাটির চাক হাতে নিয়ে টিপে টিপে নানা ধরনের ও নানা আকারের পুতুল তৈরি করে। টিপে টিপে তৈরি করা হয় বলে এসব পুতুলের নাম টেপা পুতুল। তবে এসব মাটির পুতুলের হাত-পা বা জোড়াগুলো একটু ভিজে ভিজে মাটি দিয়ে যত্ন করে লাগাতে হয়।

নকশা – রেখা দিয়ে আঁকা ছবি। শখের হাঁড়ি, টেপা পুতুল বা পশুপাখির গায়ে গ্রামের কুমোর শিল্পীরা নানা রঙের ছবি আঁকে। এ ছবিগুলোই হলো নকশা।

শালবন বিহার – কুমিল্লার ময়নামতিতে মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন। অষ্টাদশ শতকের এই পুরাকীর্তি বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতার পরিচায়ক। শালবন বিহারে পাওয়া গেছে নানা ধরনের পোড়ামাটির ফলক।

টেরাকোটা – 'টেরা' অর্থ মাটি, আর 'কোটা' অর্থ পোড়ানো। পোড়ামাটির তৈরি মানুষের ব্যবহারের সব রকমের জিনিস টেরাকোটা হিসেবে পরিচিত।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নিই ও লিখি।

(ক) মাটির শিল্প বলতে কী বুঝি ?
(খ) বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পকর্ম কোনটি ?
(গ) শখের হাঁড়ি কী রকম ?
(ঘ) বৈশাখী মেলায় কী কী পাওয়া যায় ?
(ঙ) মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান কী ?
(চ) কয়েকটি মৃৎশিল্পের নাম বলি।
(ছ) টেরাকোটা কী ?
(জ) বাংলাদেশের কোথায় পোড়ামাটির প্রাচীন শিল্প দেখতে পাওয়া যায় ?
(ঝ) মাটির শিল্প আমাদের ঐতিহ্য ও গৌরবের বিষয় কেন ?

৪. নিচের কথাগুলো সহজ করে বুঝিয়ে বলি।

(ক) মৃৎশিল্প
(খ) শখের হাঁড়ি
(গ) টেরাকোটা
(ঘ) টেপা পুতুল

৫. মামার বাড়ি, রসের হাঁড়ি – কথাটি কেন প্রচলিত ?

৬. কর্ম-অনুশীলন।

তোমার দেখা কুমোর পাড়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শনাক্ত করি ও লিখি।

(ক) বেলাল হোসেন একটি দোকান দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তার দোকানে বিক্রির জন্য চাল, ডাল, তেল, স্নো, পাউডার, খাতা, কলম, পেনসিল এবং এর সাথে কিছু খেলনাও রাখলেন। তিনি দোকানের একটি নাম দিতে চান। নিচের কোন নামটি যথার্থ – সেটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিই।

(ক) বেলাল হার্ডওয়ার (খ) বেলাল ইলেক্ট্রনিকস

(গ) বেলাল জেনারেল স্টোর (ঘ) বেলাল বুকস

(খ) কোনো বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়েদের জন্য পৃথক দুটো টয়লেট আছে। নিচে কোন ছবিটি কোন টয়লেটের দরজায় লাগাতে হবে – তা ছবির নিচের ফাঁকা ঘরে লিখি।

(গ) নিচের চিহ্নটি কোনো কিছুতে যুক্ত থাকলে কী বোঝা যাবে – তা লিখি।

স্বদেশ

আহসান হাবীব

এই যে নদী
নদীর জোয়ার
নৌকা সারে সারে,
একলা বসে আপন মনে
বসে নদীর ধারে–
এই ছবিটি চেনা।
মনের মধ্যে যখন খুশি
এই ছবিটি আঁকি,
এক পাশে তার জারুল গাছে
দুটি হলুদ পাখি–
এমনি পাওয়া এই ছবিটি
কড়িতে নয় কেনা।

মাঠের পরে মাঠ চলেছে
নেই যেন এর শেষ
নানা কাজের মানুষগুলো
আছে নানান বেশ।
মাঠের মানুষ যায় মাঠে আর
হাটের মানুষ হাটে
দেখে দেখে একটি ছেলের
সারাটি দিন কাটে।

এই ছেলেটির মুখ
সারাদেশের সব ছেলেদের
মুখেতে টুকটুক।
কে তুমি ভাই,
প্রশ্ন করি যখন
'ভালোবাসার শিল্পী আমি'
বলবে হেসে তখন।

'এই যে ছবি এমন আঁকা
ছবির মতো দেশ,
দেশের মাটি দেশের মানুষ
নানা রকম বেশ,
বাড়ি বাগান পাখপাখালি
সব মিলে এক ছবি,
নেই তুলি নেই রঙ, তবুও
আঁকতে পারি সবই।'

পাঠ শিখি

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, অর্থাৎ এদেশে সবখানেই নদী দেখা যায়। 'স্বদেশ' কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। একটি ছেলে সেই ছবি দেখছে ও তার মনের ভিতরে ধরে রাখছে। নদীর জোয়ার, নদীতীরে নৌকা বেঁধে রাখা, গাছে গাছে পাখির কলকাকলি – সবই ছেলেটির মনে নিজের দেশের জন্য মায়া–মমতা ও ভালোবাসার অনুভূতি জোগাচ্ছে।

২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই ও ব্যবহার শিখি।

কড়ি – এক ধরনের ছোট্ট সাদা ঝিনুক। এদেশে আগে এখনকার মতো টাকা–পয়সা ছিল না। লোকে কেনা-বেচা করত কড়ি দিয়ে।

টুকটুক – গাঢ়, সুন্দর। মেলা থেকে বোনের জন্য টুকটুকে একটা জামা কিনে আনব।

শিল্পী – যিনি কোনো শিল্পকলার চর্চা করেন তিনিই শিল্পী – যেমন সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রশিল্পী। জয়নুল আবেদিন ছিলেন একজন বড় মাপের চিত্রশিল্পী।

পাখপাখালি – নানা ধরনের পাখি। বাংলাদেশের গাছে গাছে শোনা যায় পাখপাখালির কলকাকলি।

৩. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

(ক) এমনি পাওয়া এই ছবিটি কড়িতে নয় কেনা। – বাংলাদেশ চির সবুজের দেশ। সোনালি আঁশের দেশ। শস্য শ্যামল বাংলাদেশের মাঠে মাঠে নানা ফসলের খেত। গাছে গাছে পাখি। এঁকেবেঁকে চলেছে অসংখ্য নদী। এর একদিকে পাহাড় আর অন্য দিকে সাগর। সব কিছুতেই প্রকৃতির এক অপরূপ ছোঁয়া। শিল্পী রং তুলি দিয়ে এ প্রকৃতিরই ছবি আঁকেন। কখনো কখনো তা বিক্রি হয়। অনেকে কিনে নেন। কিন্তু শান্ত-শ্যামল প্রকৃতির এই মন জুড়ানো ছবি? এই ছবি টাকা পয়সা দিয়ে কেনা যায় না।

(খ) মাঠের পরে মাঠ চলেছে
নেই যেন এর শেষ

– সুজলা সুফলা শস্য শ্যামল আমাদের এই বাংলাদেশ। মাঠে মাঠে ফসলের খেত। বাতাস বয়ে যায় তার ওপর দিয়ে। মনে হয়, নদীর ঢেউ মাঠে ছড়িয়ে পড়েছে। অবারিত খোলা সবুজ মাঠ, মাঝে মাঝে গ্রাম, আবার মাঠ। গ্রাম মাঠের সাথে মিশে যায়। মনে হয় সব কিছু মাঠের উপাদান। মাঠের পর মাঠ পরপর চলে গেছে, কোথাও শেষ হচ্ছে না।

(গ) 'এই যে ছবি এমন আঁকা
ছবির মতো দেশ,
দেশের মাটি দেশের মানুষ
নানা রকম বেশ,

– নদী, নালা, পাহাড়, সমুদ্র সব মিলে এ দেশ একটি ছবির মতন। এর এক এক ঋতুর চেহারা এক এক রকম। সব সুন্দর। বিভিন্ন ধরনের মানুষের দেশ এটা। প্রকৃতি মাঝে মাঝে রং বদলায়। যেমন ছবিতে নানান রং ব্যবহার করা হয়। এদেশের মানুষজনও নানা রকমের বেশভূষা পরে।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।

(ক) গ্রাম বাংলার কোন ছবিটি আমাদের চেনা ?
(খ) কোন ছবিটি টাকা দিয়ে কেনা যায় না ?
(গ) কী দেখে ছেলেটির দিন কেটে যায় ?
(ঘ) 'সব মিলে এক ছবি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?

৫. শূন্যস্থান পূরণ করি।

'এই যে ছবি ————
——— মতো দেশ,
———— দেশের মানুষ
নানা রকম বেশ,
বাড়ি বাগান ————
সব মিলে এক ———,
নেই —— নেই ———, তবুও
আঁকতে পারি সবই।'

৬. কর্ম-অনুশীলন।

(ক) আমাদের দেশ সম্পর্কে একটি রচনা লিখি।
(খ) নিচের ফরমটি খাতায়/কাগজে লিখে পূরণ করি।

আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগিতা ফরম

১। শিক্ষার্থীর নাম : .....
২। বিদ্যালয়ের নাম : .....
৩। শ্রেণি : ..... রোল নং: .....
৪। (ক) শিক্ষার্থীর পিতার নাম: .....
(খ) শিক্ষার্থীর মায়ের নাম: .....
৫। বর্তমান ঠিকানা:
গ্রাম / সড়ক নং – ..... ডাকঘর / মহল্লা – .....
উপজেলা – ..... জেলা – .....

৬। স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম / সড়ক নং – ..... ডাকঘর / মহল্লা – .....
উপজেলা – ..... জেলা – .....

৭। জন্ম তারিখ: .....

৮। যে সব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক:

(ক) .....

(খ) .....

(গ) .....

....
শ্রেণিশিক্ষকের স্বাক্ষর শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

কবি পরিচিতি

আহসান হাবীব

কবি আহসান হাবীব ১৯১৭ সালে পিরোজপুর জেলার শঙ্করপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিশু-কিশোরদের জন্য তিনি প্রচুর ছড়া ও কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতার ছন্দ ও শব্দ সহজেই মন কাড়ে। তিনি ছিলেন পেশায় সাংবাদিক। তিনি দীর্ঘদিন নানা পত্রিকার সাহিত্যের পাতার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' ও 'ছুটির দিন দুপুরে' তাঁর শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থ। ১৯৮৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কাঁকনমালা আর কাঞ্চনমালা

এক দেশে ছিল এক রাজা। রাজার একটাই পুত্র। রাজপুত্রের সঙ্গে সেই রাজ্যের রাখাল ছেলের খুব ভাব। দুই বন্ধু পরস্পরকে খুব ভালোবাসে। রাখাল মাঠে গরু চরায়, রাজপুত্র গাছতলায় বসে তার জন্য অপেক্ষা করে। নিঝুম দুপুরে রাখাল বাঁশি বাজায়, রাজপুত্র তার বন্ধু রাখালের গলা জড়িয়ে বসে সেই সুর শোনে। বন্ধুর জন্য বাঁশি বাজিয়ে রাখাল বড় সুখ পায়।

আর, তা শুনে রাজপুত্রের মন খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে। রাজপুত্র তার রাখাল বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করে, বড় হয়ে সে যখন রাজা হবে, তখন রাখালকে তার মন্ত্রী বানাবে।

তারপর একদিন রাজপুত্র রাজা হয়। হাতিশালে হাতি তার, ঘোড়াশালে ঘোড়া। লোকলস্কর, সৈন্যসামন্তে গমগম করে তার রাজপুরী, রাজকোষ ভরা থাকে মণিমাণিক্যে, আর রাজপুরী আলো করে থাকে রানি কাঞ্চনমালা। চারিদিকে তার থৈ থৈ সুখ। এত সুখের দিনে মাঠের রাখালবন্ধুর কথা তার মনেও পড়ে না, মনেও পড়ে না সেই প্রতিজ্ঞার কথা। রাজপুত্র বন্ধুকে ভুলে যায়।

এদিকে, রাখালবন্ধুর কিন্তু খুব মনে পড়ে বন্ধু রাজপুত্রের কথা। বন্ধুর জন্য মনখারাপ হতে থাকে তার। শেষে সে একদিন চলেই আসে নগরে, বন্ধুকে একটুখানি দেখার জন্য। কিন্তু রাজপ্রাসাদের সদর দরজার রক্ষীরা অমন গরিব রাখালকে ভেতরে ঢুকতে দেয় না। মনভরা কষ্ট নিয়ে সারাদিন প্রাসাদের বন্ধ দরজার সামনে রাখাল বন্ধু দাঁড়িয়েই থাকে, রাজার দেখা মেলে না। শেষে সন্ধ্যাবেলা, মনের কষ্ট নিয়ে দুঃখী রাখাল কোথায় যে চলে যায়, কেউ তা বলতে পারে না।

এক রাতে রাজা ঘুমাতে যান। কিন্তু যখন ভোর বেলা তার ঘুম ভাঙে, তখনই দেখা যায় কী সর্বনাশ ঘটেছে! রাজা দেখে যে, কিছুতেই সে চোখ খুলতেই পারছে না। কী হলো কী হলো! মন্ত্রী, সেনাপতি, দাসদাসী আর রানি ছুটে এসে দেখে, রাজার শরীর ভরে গেঁথে আছে সুচ আর সুচ। চোখ মুখ শরীরে গাঁথা রয়েছে অগুণতি সুচ, এমনকী মাথার যে চুল, তাও সুচ হয়ে গেছে। রাজা চোখ মেলতে পারেন না, কথা বলতে পারেন না, শুতে পারেন না, খেতেও পারেন না। রাজা বোঝেন– প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের সেই অপরাধেই আজকে তার এই দশা। মনের হাহাকার মনে চেপে দুঃখ ভোগ করতে শুরু করেন রাজা। রাজ্য জুড়ে কান্নাকাটির রোল পড়ে যায়। রাজ্যসংসার অচল হয়ে যায় প্রায়। তখন রানি কাঞ্চনমালা চোখের জল মুছতে মুছতে রাজ্য আর সংসার দেখাশোনা শুরু করেন।

দুঃখের দিন দুঃখে দুঃখে যেতে থাকে কাঞ্চনমালার। একদিন নদীর ঘাটে যান। স্নান করতে কোথেকে জানি একটা মেয়ে এসে তাকে বলে, রানির যদি দাসীর দরকার হয়, তো সে দাসী হবে। রাজার শরীর থেকে সুচ খোলার জন্য একজনের দরকার ছিল রানি কাঞ্চনমালার। মেয়েটাকে সেই কাজের জন্য নিয়ে নেন রানি। নদীর ঘাটে গেছেন রানি, সঙ্গে তার কী করে থাকে টাকাকড়ি! তখন হাতের সোনার কাঁকন দিয়েই রানিকে কিনতে হয় ওই দাসী। তাই তার নাম কাঁকনমালা।

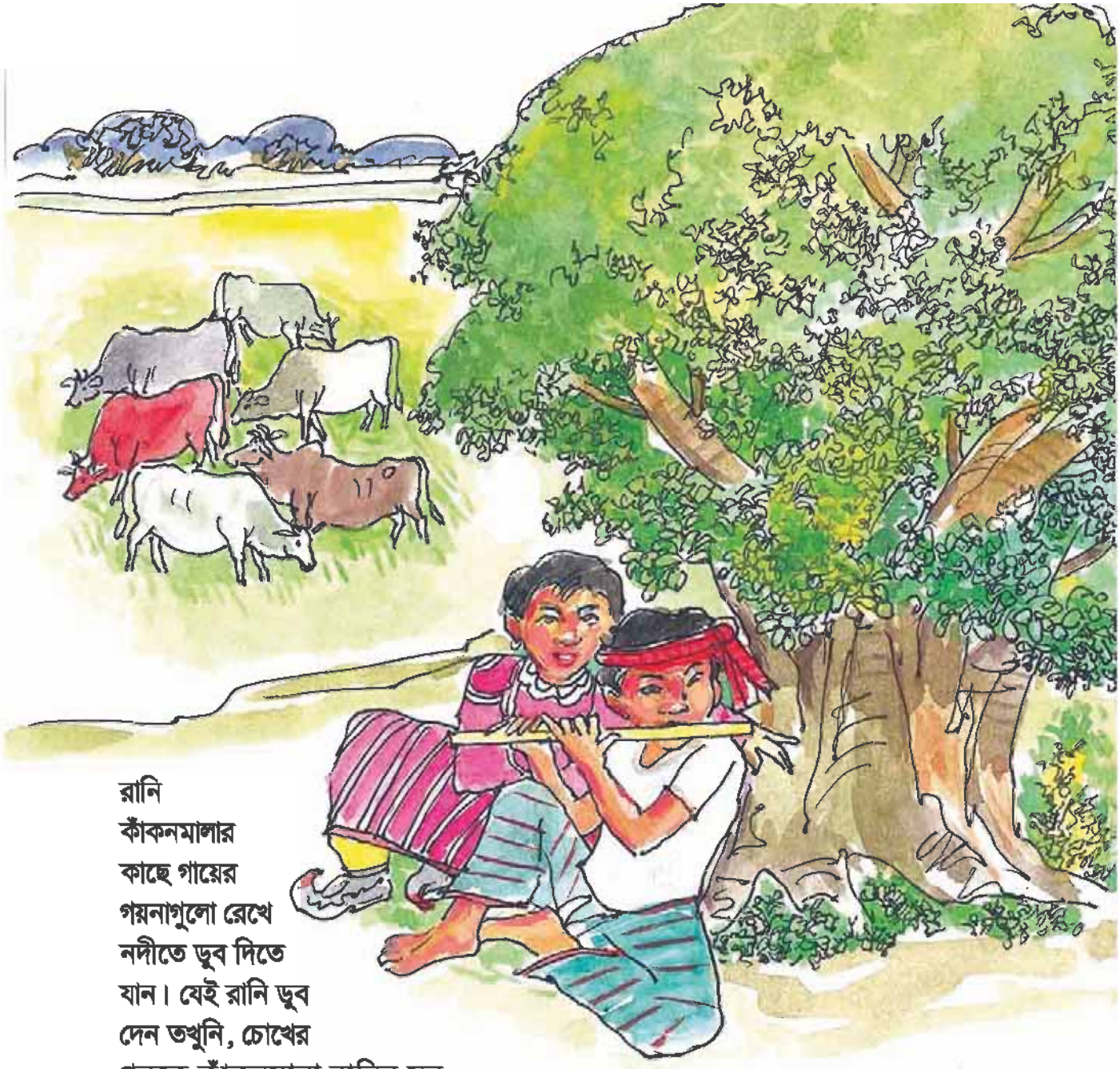

রানি কাঁকনমালার কাছে গায়ের গয়নাগুলো রেখে নদীতে ডুব দিতে যান। যেই রানি ডুব দেন তখুনি, চোখের পলকে কাঁকনমালা রানির সব গয়না নিজে পরে নেয়, ঘাটে রাখা রানির শাড়িও পরে। রানি ডুব দিয়ে উঠে দেখেন দাসী হয়ে গেছে রানি, আর রানি কাঞ্চনমালা হয়ে গেছেন দাসী।

নকল রানি কাঁকনমালার সেকি দম্ভ! মন্ত্রীকে ধমক দেয়, সেনাপতির মাথা কাটার জন্য জল্লাদকে ডাকে। রাজপুরীর সকলে তার ভয়ে কাঁপতে থাকে। সকলে রানির এমন ব্যবহারে চমকে উঠে ভাবতে থাকে, তাদের রানি তো এমন ছিল না!

দয়ালু, মায়াবতী রানি তাদের হঠাৎ এমন কঠোর নির্দয় কী করে হলো! ভয়ে উদ্বেগে আসল রানি কাঞ্চনমালার মুখ খোলার কোনো উপায়ই থাকে না। সুচবেঁধা রাজা জানতেই পারেন না, তার রাজ্যে আরেক কী ঘোর ঝামেলা এসে গেছে।

দুঃখিনী কাঞ্চনমালা রাজবাড়ির সকল কাজকর্ম করে, আঁস্তাকুড়ে বসে মাছ কাটেন চোখের জল ফেলেন আর বিলাপ করেন –

হাতের কাঁকন দিয়া কিনিলাম দাসী,
সেই হইল রানি, আমি হইলাম দাসী।
কি বা পাপে সোনার রাজার রাজ্য গেল ছার।
কি বা পাপে ভাঙিল কপাল কাঞ্চনমালার?

হাতে কাঞ্চনমালার একটুও ফুরসত থাকে না যে, সুচরাজার যত্ন করেন, কী তার পাশে দুদণ্ড বসেন। নকল রানি রাজার দিকে ফিরেও তাকায় না। রাজার কষ্টের সীমা থাকে না। সুচ বেধা শরীর ব্যথায় টনটন করে, চিনচিন করে জ্বলতে থাকে, গায়ে মাছি এসে বসে ঝাঁকে ঝাঁকে, কে তাকে বাতাস করে, কে তাকে দেখে!

একদিন নকল রানি কাঞ্চনমালাকে একরাশ কাপড় ধুতে পাঠায় নদীর ঘাটে। মাথায় কাপড়ের বোঝা নিয়ে কাঞ্চনমালা এক পা এগোন এক পা থামেন। চোখের জলে তার বুক ভেসে যেতে থাকে। এমন সময় কাঞ্চনমালা শোনেন, বনের পাশের গাছতলা থেকে কেমন এক অদ্ভুত মন্ত্র কে জানি বলেই যাচ্ছে:

পাই এক হাজার সুচ
তবে খাই তরমুজ!
সুচ পেতাম পাঁচ হাজার
তবে যেতাম হাট বাজার!
যদি পাই লাখ
তবে দেই রাজ্যপাট!

মাথার বোঝা নামিয়ে কাঞ্চনমালা ছুটে তার কাছে যান । বলেন, লাখ লাখ সুচ চাও তো? আমি দিতে পারি। এ কথা শুনে সেই মানুষ ঝটপট তার সুতার পুঁটলি তুলে নিয়ে কাঞ্চনমালার সাথে হাঁটা ধরে। যেতে যেতে পথে কাঞ্চনমালা চোখের জল ফেলতে ফেলতে দুঃখের সব কথা সেই মানুষকে না বলে পারেন না। অচেনা মানুষ শোনে, মুখ থমথমে হয়ে যেতে থাকে তার।

রাজপুরীতে গিয়ে ওই অচিন মানুষ সুচ নেবার কথাটাও বলে না। বলতে থাকে অন্য কথা। বলে, আজকের দিন বড় শুভ দিন। আজ হচ্ছে পিটকুড়ুলির ব্রত, আজকের দিনে রানিদের পিঠা বিলাতে হয় – এমনই নিয়ম। নকল রানি পিঠা বানাতে যায়। সে কাঞ্চনমালাকেও পিঠা বানাতে ফরমাশ দেয়। নকল রানি বানায় আস্কে পিঠা, চাস্কে পিঠা, যাস্কে পিঠা। সে পিঠা কেউ মুখেও তুলতে পারে না, এমনই বিস্বাদ! দুঃখিনী কাঞ্চনমালা বানান চন্দ্রপুলী, মোহনবাঁশী, ক্ষীর মুরলী পিঠা। মুখে দেওয়া মাত্র সকলের মন ভরে যায়। এমনই স্বাদ তার। নকল রানি উঠানে আল্পনা দিতে যায়। কোথায় নকশা কোথায় কী – এখানে এক খাবলা রঙ লেপে, ওখানে এক খাবলা লেপে। দেখতে সেকি অসুন্দর যে দেখায়! আর কাঞ্চনমালা আঁকেন পদ্মলতা। তার পাশে আঁকেন সোনার সাত কলস, ধানের ছড়া, ময়ূর-পুতুল। লোকে তখন বুঝতে পারে কে আসল রানি, আর কে দাসী।

তখন সেই অচেনা মানুষটা কাঁকনমালাকে ডাক দিয়ে বলে – হাতের কাঁকনে কেনা দাসী, জলদি সত্যি কথা বল । কাঁকনমালার সেকি রাগ। সে গর্জে উঠে জল্লাদকে হুকুম দেয়, অচেনা মানুষ আর কাঞ্চনমালার গর্দান নিতে। জল্লাদ ওদের ধরতে আসার আগেই অচেনা মানুষ তার সুতার পুঁটলিকে হুকুম দেয় :

সূতন সূতন নেবোর পো,
জল্লাদকে বেঁধে থো।

এক গোছা সুতা গিয়ে জল্লাদকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে। নকল রানি আবার গর্জে ওঠার আগেই অচিন মানুষ নতুন মন্ত্র পড়া ধরে :

সূতন সূতন সরুলি, কোন দেশে ঘর
সুচ রাজার সুচ গিয়ে আপনি পর।

সঙ্গে সঙ্গে লাখ লাখ সুতা রাজার গায়ের লাখ লাখ সুচ ঢুকে যায়। আবার মন্ত্র পড়ে অচিন মানুষ, সব সুচ রাজার শরীর থেকে বেরিয়ে এসে নকল রানির চোখে মুখে বিঁধে যায়। জ্বালা যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে নকল রানি শেষে মরে। কাঞ্চনমালার দুঃখের দিন শেষ হয়।

এদিকে, রাজা বহু বছর পরে চোখ মেলেন। বহু বছর পরে তার চোখ দেখে সূর্যের আলো, সবুজ পাতা; আর দেখে – সামনে কে যেন দাঁড়িয়ে! কে! সেই রাখালবন্ধু! রাজা দুহাতে জড়িয়ে ধরেন। কেঁদে জেরবার হয় রাখালবন্ধু। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে রাজা ক্ষমা চায় তার বন্ধুর কাছে। কথা দিয়ে কথা রাখেনি তো রাজা! সেই ভুলের জন্য ক্ষমা চায়, আর বলে, বন্ধু, আজ থেকে তুমি আমার মন্ত্রী। এই রইল রাজ্য আমার, শুধু তুমি আমার পাশে থেকো! সারা জীবনের জন্য থাকো। রাখালবন্ধু কি তখন না থেকে পারে!

রাজা তার বন্ধুকে নতুন একটা বাঁশি গড়িয়ে দেন, সোনার বাঁশি। রাখাল সারাদিন মন্ত্রীর কাজ করে, প্রজাদের দুঃখ সরিয়ে তাদের মুখে হাসি আনে। সারাদিন তার কাজ আর কাজ। আর, রাতে যখন চাঁদের আলোয় আকাশ ও পৃথিবী ঝকমকিয়ে ওঠে, তখন দুই বন্ধু যায় সেই নিরালা মাঠের গাছতলাতে। পুরোনো দিনের মতো রাখালবন্ধু তখন বাঁশি বাজায়, আর বন্ধু রাজা তার গলা জড়িয়ে ধরে সেই সুর শোনে। সুখে তার মন ভরে ওঠে, সেই ছোট্ট বেলার মতোই।

আমার বাংলা বই

পাঠ শিখি

১. নিচের শব্দগুলোর অর্থ শিখি এবং বাক্য তৈরি করি ও লিখি।

আকুল – চঞ্চল, অস্থির।
আষ্টেপৃষ্টে – সর্বাঙ্গে, সারা শরীরে।
গর্দান – ঘাড়ের ওপর থেকে মাথা।
গর্জে ওঠা – হুংকার দিয়ে ওঠা।
স্বাদ – খেতে ভালো লাগে এমন।
বিস্বাদ – খেতে মজা নয় এমন।
পুঁটলি – বোঁচকা।
ফরমাস – হুকুম, আদেশ।
ঘোর – অত্যন্ত, অনেক বেশি, গভীর।
আঁস্তাকুড় – ময়লা, আবর্জনা ফেলার জায়গা।
ফুরসত – অবসর, অবকাশ, ছুটি।
টনটন – যন্ত্রণা বোঝায় এমন অনুভূতি।
চিনচিন – অল্প অল্প ব্যথা বা জ্বালা বোঝায় এমন শব্দ।
মায়াবতী – দয়া, মমতা আছে যে নারীর।
কাঁকন – হাতের পরার গহনা।
দম্ভ – অহংকার, গর্ব।
রক্ষী – প্রহরী, সেনা।
হাতিশাল – যেখানে রাজার হাতি রাখা হয়।
মণিমাণিক্য – মূল্যবান পাথর, বহুমূল্য রত্ন।
রাজকোষ – রাজার ধন যেখানে থাকে।
রাজপ্রাসাদ – রাজপুরী বা রাজবাড়ি।
পরস্পর – একের সঙ্গে অন্যের।
জেরবার – অস্থির

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি এবং লিখি।

(ক) ছোটবেলায় রাজপুত্র কোথায় বসে রাখাল বন্ধুর বাঁশি শুনত ?
(খ) রাজপুত্র তার বন্ধুর কাছে কী প্রতিজ্ঞা করেছিল ?

(গ) রক্ষীরা রাখালকে প্রাসাদে ঢুকতে দিল না কেন ?
(ঘ) রাজার শরীর কখন সুচবেঁধা হয়ে যায় ?
(ঙ) কাঁকনমালা কে? কেন তার এমন নাম ?
(চ) কাঁকনমালা কাঞ্চনমালার সাথে কেমন আচরণ করে ? কেন করে ?
(ছ) কাঞ্চনমালা কোথায় অচেনা মানুষের দেখা পায় ?
(জ) অচেনা মানুষ কীভাবে সুচরাজা ও কাঞ্চনমালাকে উদ্ধার করে ?
(ঝ) কাঞ্চনমালা কী কী পিঠা বানায় ?
(ঞ) কার আল্পনা দেওয়া ভালো হয়েছিল ? কেন ?
(ট) কীভাবে লোকেরা নকল রানিকে বুঝে ফেলল ?
(ঠ) রাজা কীভাবে তার প্রতিজ্ঞা পালন করল ?
(ড) গল্পটা তোমার কেমন লেগেছে? কেন এমন লেগেছে ?
(ঢ) অচেনা মানুষ যে ব্রতটার কথা বলে তার নাম কী ? এই ব্রতের দিন রানিদের কী করতে হয় ?

৩. নিচের শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করে মুখে বলি ও লিখি।

নিঝুম, সুখ, রাজপুত্র, প্রতিজ্ঞা, টনটন, ময়ূর, পদ্মলতা, চিনচিন, ঝলমল, বাঁশি, চাঁদের আলো, রাজ্য, বিলাপ, ব্যবহার।

৪. বিপরীত শব্দ লিখি।

সুখ, নির্দয়, মায়া, কান্না, চেনা, অসুন্দর, স্বাদ, কষ্ট, নকল, রানি, রাজপুত্র, দম্ভ, নগর, সন্ধ্যা, ভালো, বড়, খুশি, আলো।

৫. নিচের বাক্যাংশ ও বাক্যগুলো পড়ি।

ব্যথায় টনটন করা – খুব ব্যথা করা। সুচবেঁধা রাজার শরীর ব্যথায় টনটন করত দিনরাত।

খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠা – মন আনন্দে ভরে ওঠা। রাখাল বন্ধুর বাঁশির সুর শুনে রাজপুত্রের মন খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠত।

ঝকমকিয়ে ওঠা – ঝলমল করা। শীতের সকালে সূর্য উঠলেই চারপাশ ঝকমকিয়ে ওঠে।

৬. গল্পে 'থৈ থৈ', 'থম থম' এরকম শব্দ আছে। এই ধরনের আরও কয়েকটি শব্দের ব্যবহার শিখি (এখানে একটি দেখানো হলো)।

থৈথৈ	– বর্ষার পানিতে মাঠ-ঘাট থৈথৈ করছে
হৈহৈ	–
রইরই	–
কনকন	–
ঝনঝন	–
ভনভন	–
শনশন	–
গমগম	–

৭. যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করে পড়ি ও লিখি।

ষ্ম	–	ব্রহ্মপুত্র, ব্রাহ্মণবড়িয়া,
ক্ব	–	পরিপক্ব, ক্বচিৎ
ণ্ড	–	গণ্ডার, পাষণ্ড
ণ্ট	–	ঘণ্টা, কণ্টক
ঞ্চ	–	পঞ্চম, সঞ্চয়

অবাক জলপান

সুকুমার রায়

পাত্রগণ : পথিক। ঝুড়িওয়ালা। প্রথম বৃদ্ধ। দ্বিতীয় বৃদ্ধ। ছোকরা। খোকা। মামা।

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

[ছাতা মাথায় এক পথিকের প্রবেশ। পিঠে লাঠির আগায় লোটা–বাঁধা পুঁটলি। উসকো–খুসকো চুল। ভ্রান্ত চেহারা]

পথিক। নাঃ একটু জল না পেলে আর চলছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখনও প্রায় এক ঘণ্টার পথ বাকি।

তেষ্টায় মগজের ঘিলু পর্যন্ত শুকিয়ে উঠল। কিন্তু জল চাই কার কাছে? গেরস্তর বাড়ি, দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। বেশি চ্যাঁচাতে গেলে হয়তো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে। পথেও তো লোকজন দেখছি নে। – ওই একজন আসছে! ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক।

[ঝুড়ি মাথায় এক ব্যক্তির প্রবেশ]

পথিক। মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?

ঝুড়িওয়ালা। জলপাই? জলপাই এখন কোথায় পাবেন? এ তো জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান তো দিতে পারি –

পথিক। না, না, আমি তা বলিনি –

ঝুড়িওয়ালা। না, কাঁচা আম আপনি বলেননি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কিনা, তা তো আর এখন পাওয়া যাবে না, তাই বলছিলুম –

পথিক। না হে, আমি জলপাই চাচ্ছিনে –

ঝুড়িওয়ালা। চাচ্ছেন না তো, 'কোথায় পাব' 'কোথায় পাব' কচ্ছেন কেন? খামখা এরকম করবার মানে কী?

পথিক। আপনি ভুল বুঝছেন – আমি জল চাচ্ছিলাম –

ঝুড়িওয়ালা। জল চাচ্ছেন তো 'জল' বললেই হয় – 'জলপাই' বলবার দরকার কী? জল আর জলপাই কি এক হলো? আলু আর আলুবোখরা কি সমান? মাছও যা আর মাছরাঙাও তাই? বরকে কি আপনি বরকন্দাজ বলেন? চাল কিনতে গিয়ে কি চালতার খোঁজ করেন?

পথিক। ঘাট হয়েছে মশাই। আপনার সঙ্গে কথা বলাই আমার অন্যায় হয়েছে।

ঝুড়িওয়ালা। অন্যায় তো হয়েছেই। দেখছেন ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছি – তবে জল চাচ্ছেন কেন? ঝুড়িতে করে কি জল নেয়? লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয়।

[ঝুড়িওয়ালার প্রস্থান]

পথিক। দেখলে! কী কথায় কী বানিয়ে ফেললে! ওই বুড়ো আসছে, ওকে একবার বলে দেখি।

[লাঠি হাতে, চটি পায়ে, চাদর গায়ে এক বৃদ্ধের প্রবেশ]

বৃদ্ধ। কে ও? গোপলা নাকি?

পথিক। আজ্ঞে না, আমি পূবগাঁয়ের লোক – একটু জলের খোঁজ কচ্ছিলুম –

বৃদ্ধ। বলো কী হে? পুবগাঁও ছেড়ে এখানে এয়েছ জলের খোঁজ করতে? – হাঃ হাঃ হাঃ। তা যাই বলো বাপু, অমন জল কিন্তু কোথাও পাবে না। খাসা জল। তোফা জল। চমৎকার জল।

পথিক। আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে বেজায় তেষ্টা পেয়ে গেছে।

বৃদ্ধ। তা তো পাবেই। ভালো জল যদি হয়, তা দেখলে তেষ্টা পায়, নাম করলে তেষ্টা পায়, ভাবতে গেলে তেষ্টা পায়। তেমন তেমন জল তো খাওনি কখনও? – বলি ঘুমড়ির জল খেয়েছ কোনোদিন?

পথিক। আজ্ঞে না, তা খাইনি –

বৃদ্ধ। খাওনি? অ্যাঃ ঘুমড়ি হচ্ছে আমার মামাবাড়ি – আদত জলের জায়গা। সেখানকার যে জল, সে কী বলব তোমায়? কত জল খেলাম – কলের জল, নদীর জল, ঝরনার জল, পুকুরের জল – কিন্তু মামাবাড়ির কুয়োর যে জল, অমনটি আর কোথাও খেলাম না।

পথিক। তা মশায় আপনার জল আপনি মাথায় করে রাখুন – আপাতত এখন এই তেষ্টার সময় যা হয় একটু জল আমার গলায় পড়লেই চলবে –

বৃদ্ধ। তা হলে বাপু তোমার গাঁয়ে বসে জল খেলেই পারতে? পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে জল খেতে আসবার দরকার কী ছিল? 'যা হয় একটু হলেই হলো' ও আবার কী রকম কথা? আর অমন তাচ্ছিল্য করে বলবারই বা দরকার কী? আমাদের জল পছন্দ না হয় খেয়ো না – ব্যস। গায়ে পড়ে নিন্দে করবার দরকার কী? আমি ওরকম ভালোবাসিনে। হ্যাঁঃ –

[রাগে গজগজ করিতে করিতে প্রস্থান]

[পাশের এক বাড়ির জানালা খুলিয়া আর এক বৃদ্ধের হাসিমুখ বাহিরকরণ]

বৃদ্ধ। কী হে? এত তর্কাতর্কি কীসের?

পথিক। আজ্ঞে না, তর্ক নয়। আমি জল চাচ্ছিলুম, তা উনি সে কথা কানেই নেন না – কেবলই সাত–পাঁচ গপ্‌পো করতে লেগেছেন। তাই বলতে গেলুম তো রেগেমেগে অস্থির!

বৃদ্ধ। আরে দূর দূর! তুমিও যেমন! জিজ্ঞেস করবার আর লোক পাওনি? ও হতভাগা জানেই বা কী আর বলবেই বা কী? ওর যে দাদা আছে, খালিপুরে চাকরি করে, সেটা তো একটা আস্ত গাধা। ও মুখ্যুটা কী বলবে তোমায়?

পথিক। কী জানি মশাই – জলের কথা বলতেই কুয়োর জল, নদীর জল, পুকুরের জল, কলের জল, মামাবাড়ির জল বলে পাঁচরকম ফর্দ শুনিয়ে দিলে –

বৃদ্ধ। হুঁঃ – ভাবলে খুব বাহাদুরি করেছি। তোমায় বোকামতো দেখে খুব চাল চেলে নিয়েছে। ভারি তো ফর্দ করেছেন, আমি লিখে দিতে পারি, ও যদি পাঁচটা জল বলে থাকে তো আমি এক্ষুণি পঁচিশটা বলে দেব –

পথিক। না মশাই, গুনিনি – আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই –

বৃদ্ধ। তোমার কাজ না থাকলেও আমার কাজ থাকতে পারে তো? যাও, যাও, মেলা বকিয়ো না – একবারে অপদার্থের একশেষ।

[বৃদ্ধের সশব্দে জানালা বন্ধকরণ]

[নেপথ্যে বাড়ির ভিতরে বালকের পাঠ]

পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল।
সমুদ্রের জল লবণাক্ত, অতি বিস্বাদ]

পথিক। ওহে খোকা! এদিকে শুনে যাও তো?

[রুক্ষমূর্তি, মাথায় টাক, লম্বা দাড়ি খোকার মামা বাড়ি হইতে বাহির হইলেন]

মামা। কে হে? পড়ার সময় ডাকাডাকি করতে এয়েছ? – (পথিককে দেখিয়া) ও! আমি মনে করেছিলুম পাড়ার কোনও ছোকরা বুঝি! আপনার কী দরকার?

পথিক। আজ্ঞে, জলতেষ্টায় বড় কষ্ট পাচ্ছি – তা একটু জলের খবর কেউ বলতে পারলে না।

[মামার তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলিয়া দেওয়া]

মামা। কেউ বলতে পারলে না? আসুন, আসুন, কী খবর চান, কী জানতে চান, বলুন দেখি? সব আমায় জিজ্ঞেস করুন, আমি বলে দিচ্ছি।

[পথিককে মামার ঘরে টানিয়া নেওয়া]

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঘরের ভিতর

[ঘর নানা রকম যন্ত্র, নকশা, রাশি–রাশি বই ইত্যাদিতে সজ্জিত]

মামা। কী বলেছিলেন? জলের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন না?

পথিক। আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছি!

মামা। আ হা হা! কী উৎসাহ, কী আগ্রহ! শুনেও সুখ হয়। এরকম জানবার আকাঙ্ক্ষা কজনের আছে, বলুন তো? বসুন! বসুন! (কতকগুলি ছবি, বই আর এক টুকরো খড়ি বাহির করিয়া) জলের কথা জানতে গেলে প্রথমে জানা দরকার, জল কাকে বলে, জলের কী গুণ –

পথিক। আজ্ঞে, একটু খাবার জল যদি –

মামা।আসছে– ব্যস্ত হবেন না। একে একে সব কথা আসবে। জল হচ্ছে দুইভাগ হাইড্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন –

পথিক। এই মাটি করেছে!

মামা। বুঝলেন? রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলকে বিশ্লেষণ করলে হয় – হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। আর হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হলেই, হবে জল! শুনছেন তো?

পথিক। আজ্ঞে হ্যাঁ, সব শুনছি। কিন্তু একটু খাবার জল যদি দেন, তাহলে আরও মন দিয়ে শুনতে পারি।

মামা। বেশ তো! খাবার জলের কথাই নেওয়া যাক না। খাবার জল কাকে বলে? না, যে জল পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর, যাতে দুর্গন্ধ নেই, রোগের বীজ নেই – কেমন? এই দেখুন এক শিশি জল – আহা, ব্যস্ত হবেন না। দেখতে মনে হয় বেশ পরিষ্কার, কিন্তু অণুবীক্ষণ দিয়ে যদি দেখেন, দেখবেন পোকা সব কিলবিল করছে। কেঁচোর মতো, কৃমির মতো সব পোকা – এমনি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখায় ঠিক এত বড় বড়। আর এই জলটার কী দুর্গন্ধ দেখুন। পচা পুকুরের জল – ছেঁকে নিয়েছি, তবু গন্ধ।

পথিক। উঁ, হুঁ হুঁ হুঁ! করেন কী মশাই? ওসব জানবার কিচ্ছু দরকার নেই –

মামা। খুব দরকার আছে। ওসব জানতে হয় – অত্যন্ত দরকারি কথা!

পথিক। হোক দরকারি, আমি জানতে চাই নে, এখন আমার সময় নেই।

মামা। এই তো জানবার সময়। আর দু দিন বাদে যখন বুড়ো হয়ে মরতে বসবেন, তখন জেনে লাভ কী?

পথিক। দেখুন মশাই! কী করে যে কথাটা আপনাদের মাথায় ঢোকাব তা ভেবে পাই নে। বলি, বারবার করে যে বলছি– তেষ্ঠায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, সেটা তো কেউ কানে নিচ্ছেন না দেখি। একটা লোক তেষ্টায় জল জল করছে, তবু জল খেতে পায় না, এরকম কোথাও শুনেছেন?

মামা। শুনেছি বইকি, চোখে দেখেছি। বদ্যিনাথকে কুকুরে কামড়াল, বদ্যিনাথের হলো হাইড্রোফোবিয়া– যাকে বলে জলাতঙ্ক। আর জল খেতে পারে না– যেই জল খেতে যায় অমনি গলায় খিচ ধরে যায়। মহা মুশকিল!

পথিক। নাঃ এদের সঙ্গে আর পেরে ওঠা গেল না– কেনই বা মরতে এসেছিলাম এখানে? বলি মশাই, আপনার এখানে নোংরা জল আর দুর্গন্ধ জল ছাড়া ভালো জল খাঁটি জল কিছু নেই?

মামা। আছে বইকি! এই দেখুন না বোতল-ভরা টাটকা খাঁটি 'ডিস্টিল ওয়াটার'– যাকে বলে 'পরিশ্রুত জল'।

[বড় সবুজ একটি বোতল আনিয়া মামা পথিককে দেখাইলেন]

পথিক। (ব্যস্ত হইয়া) এ জল কি খায়?

মামা। না, ও জল খায় না, ওতে তো স্বাদ নেই– একবারে বোবা জল কিনা, এইমাত্র তৈরি করে আনল– এখনও গরম রয়েছে।

[পথিকের হতাশ ভাব]

তারপর যা বলছিলুম শুনুন– এই যে দেখছেন গন্ধওয়ালা নোংরা জল– এর মধ্যে দেখুন এই গোলাপি জল ঢেলে দিলুম– ব্যস, গোলাপি রঙ উড়ে সাদা হয়ে গেল। দেখলেন তো?

পথিক। না মশাই, কিচ্ছু দেখিনি, কিচ্ছু বুঝতে পারিনি, কিচ্ছু মানি না ও কিচ্ছু বিশ্বাস করি না–

মামা। কী বললেন। আমার কথা বিশ্বাস করেন না?

পথিক। না, করি না। আমি যা চাই, তা যতক্ষণ দেখাতে না পারবেন, ততক্ষণ কিচ্ছু বিশ্বাস করব না।

মামা। বটে, কোনটা দেখতে চান একবার বলুন দেখি– আমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি–

পথিক। তা হলে দেখান দেখি। সাদা, খাঁটি চমৎকার এক গেলাস খাবার জল নিয়ে দেখান দেখি। যাতে গন্ধ নেই, পোকা নেই, কলেরার পোকা নেই, ময়লা-টয়লা কিচ্ছু নেই, তা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখান দেখি। খুব বড় এক গেলাস ভর্তি জল নিয়ে দেখান তো!

মামা। এক্ষুণি দেখিয়ে দিচ্ছি– ওরে ট্যাপা, দৌড়ে আমার কুঁজো থেকে এক গেলাস জল নিয়ে আয় তো।

[পাশের ঘরে দুপদাপ শব্দে খোকার দৌড়]

নিয়ে আসুক, তারপর দেখিয়ে দিচ্ছি। ওই জলে কীরকম হয়, আর নোংরা জলে কীরকম তফাৎ হয়, সব আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

[জল লইয়া ট্যাপার প্রবেশ]

এই খানে রাখ।

[জল রাখিবামাত্র পথিকের আক্রমণ– মামার হাত হইতে জল কাড়িয়া এক নিশ্বাসে চুমুক দিয়া শেষ করা]

পথিক। আঃ বাঁচা গেল!

মামা। (চটিয়া) এটা কীরকম হলো মশাই?

পথিক। পরীক্ষা হলো– এক্সপেরিমেন্ট। এবার আপনি নোংরা জলটা একবার খেয়ে দেখান তো, কীরকম হয়?

মামা। (ভীষণ রাগিয়া) কী বললেন?

পথিক। আচ্ছা থাক, এখন নাই বা খেলেন– পরে খাবেন। আর গাঁয়ের মধ্যে আপনার মতো আনকোরা পাগল আর যতগুলো আছে, সবকটাকে খানিকটা করে খাইয়ে দেবেন। তারপর খাটিয়া তুলবার দরকার হলে আমায় খবর দেবেন– আমি খুশি হয়ে ছুটে আসব, হতভাগা জোচ্চোর কোথাকার।

[পথিকের দ্রুত প্রস্থান]

[পাশের গলিতে সুর করিয়া সে হাঁকিতে লাগিল– 'অবাক জলপান']

পাঠ শিখি

১. নাটিকাটির মূলভাব জেনে নিই।

সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান' ছোট্ট একটি নাটিকা। এতে একটি গল্প বলা হয়েছে। তবে পথিক, ঝুড়িওয়ালা, বৃদ্ধ, খোকার মামা – এই চার জন লোকের কথোপকথন বা সংলাপের মধ্য দিয়ে গল্পটি বলা হয়েছে বলে এটি নাটিকা। ছোট্ট নাটককে নাটিকা বলে। 'অবাক জলপান' নাটিকার কাহিনি হচ্ছে – ভীষণ তৃষ্ণার্ত একটি লোক পানির তেষ্টায় নানান জনের কাছে গিয়ে জল চাইছে, কিন্তু কেউ তাকে দিচ্ছে না। বরং তার কথা বলার মধ্যে নানারকম খুঁত ধরছে। শেষ পর্যন্ত বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে ফন্দি এঁটে এক বিজ্ঞানীর নিকট থেকে জল আদায় করল। এটি একটি হাসির গল্প।

২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই ও ব্যবহার শিখি।

গেরস্ত – গৃহস্থ, সংসারী লোক। গেরস্ত লোকের বহু কাজকর্ম থাকে।
বরকন্দাজ – পাহারাদার। জমিদার বাড়িতে বরকন্দাজ থাকে।
তেষ্টা – তৃষ্ণা, পিপাসা। তেষ্টায় যেন ছাতি ফেটে যাচ্ছে।
রুক্ষমূর্তি – দেখে ভয় লাগে এরকম শুকনো চেহারা। ফকিরের রুক্ষমূর্তি দেখেও মানুষ তার সেবা করে।
আকাঙ্ক্ষা – ইচ্ছা, আগ্রহ। আকাঙ্ক্ষা থাকলে মানুষ জীবনে উন্নতি করতে পারে।
খাটিয়া – কাঠের তৈরি খাট।
অণুবীক্ষণ যন্ত্র – যে যন্ত্রের সাহায্যে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বস্তু অনেক বড় দেখায়।
এক্সপেরিমেন্ট – পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।

(ক) 'বোবা জল' বলতে কী বোঝায় ?
(খ) 'জলাতঙ্ক' কাকে বলে? এই রোগ কেমন করে হয় ?

৪. কর্ম-অনুশীলন।

শিক্ষকের সহায়তায় নাটিকাটি শ্রেণিতে ধারাবাহিকভাবে অভিনয় করি।

কবি পরিচিতি
সুকুমার রায়

শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছোটদের জন্য হাসির গল্প ও কবিতা লিখে বিখ্যাত হয়ে আছেন। 'আবল-তাবোল', 'হ-য-ব-র-ল', 'পাগলা দাশু', 'বহুরূপী', 'খাইখাই', 'অবাক জলপান' তাঁর অমর সৃষ্টি। তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীও শিশুসাহিত্যিক ছিলেন, আর পুত্র সত্যজিৎ রায় বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক হলেও শিশু-কিশোরদের জন্য প্রচুর লিখেছেন। ১৯২৩ সালে সুকুমার রায় মৃত্যুবরণ করেন।

ঘাসফুল

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

আমরা ঘাসের ছোট ছোট ফুল
হাওয়াতে দোলাই মাথা,
তুলো না মোদের দোলো না পায়ে
ছিঁড়ো না নরম পাতা।

শুধু দেখো আর খুশি হও মনে
সূর্যের সাথে হাসির কিরণে
কেমন আমরা হেসে উঠি আর
দুলে দুলে নাড়ি মাথা।

ধরার বুকের স্নেহ-কণাগুলি
ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।
মোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি
রূপকথা নীল আকাশের বাঁশি –
শুনি আর দুলি শান্ত বাতাসে
যখন তারারা ফোটে।

পাঠ শিখি

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

ঘাসের ছোট ছোট ফুল অর্থাৎ ঘাসফুলের মুখ দিয়ে কবিতাটি বলানো হয়েছে। ঘাসফুল যে কী আনন্দে বেঁচে আছে, জীবনকে উপভোগ করছে সে-কথাই এখানে তারা নিজেরা বলছে। ফুল ছিঁড়ে, পায়ের নিচে পিষে ফেলে মানুষ তাদের কষ্ট যেন না দেয় – সেই মিনতি তারা করছে। গাছে ফুল ফুটলে তা দেখে আনন্দ পাওয়া চাই। ফুল ছেঁড়ার অর্থ ফুলকে মেরে ফেলা। গাছের যেমন প্রাণ আছে, ফুলেরও তেমনই প্রাণ আছে।

২. শব্দগুলোর অর্থ শিখি ও ব্যবহার জেনে নিই।

দোলাই মাথা – মাথা নাড়াই। অত জোরে মাথা দোলাতে নেই, ঘাড়ে ব্যথা হবে।
কিরণ – আলো। সকালে সূর্যের কিরণ ততটা তীব্র হয় না।
ধরা – পৃথিবী। আমাদের পায়ের নিচে যে মাটির পৃথিবী, তা-ই ধরা।
তারারা – আকাশের তারকারাজি। আঁধার আকাশে তারারা মিটিমিটি করে চায়।
ফোটে – প্রস্ফুটিত হয়, ফুটে ওঠে। ফুল গাছে ফুল ফোটে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।

(ক) হাওয়াতে কারা মাথা দোলাচ্ছে ?
(খ) ঘাসফুল আমাদের কাছে কী মিনতি করছে ? কেন করছে ?
(গ) ঘাসফুল কার সাথে নিজেকে তুলনা করেছে ? কীভাবে তুলনা করেছে ?

৪. কবিতার অংশটি ব্যাখ্যা করি।

মোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি
রূপকথা নীল আকাশের বাঁশি –
শুনি আর দুলি শান্ত বাতাসে
যখন তারারা ফোটে।

৫. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও না দেখে লিখি।

৬. কর্ম-অনুশীলন।

(ক) আমার প্রিয় ফুল সম্পর্কে একটি রচনা লিখি।

(খ) পাঠ্যবইয়ের বাইরের কোনো কবিতা বা ছড়া পড়ে তা শ্রেণিতে আবৃত্তি করি।

কবি পরিচিতি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ১৯১১ সালে পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত কবি ও গায়ক। তিনি অনেক উদ্দীপনামূলক দেশপ্রেমের গান লিখে বিখ্যাত হয়ে আছেন। সংগীতের শিক্ষক হিসেবেও তিনি খ্যাতিমান। তিনি ১৯৭৭ সালের ২৬শে অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

দেখে এলাম নায়াগ্রা

যখন তোমাদের মতো ছোট ছিলাম তখন আমিও পড়েছি নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কথা। কোথায় আর পড়ব ? বইয়েই হয়তো পড়েছি। তা না হলে, পত্রপত্রিকায় হতে পারে। 'জলপ্রপাত' শব্দটার অর্থও তখন জানতে হয়েছে। কিন্তু নিজের চোখে জলপ্রপাত দেখব কোথায় ? থাকি ঢাকা শহরে। এখানে তো আর জলপ্রপাত নেই।

কিন্তু জলপ্রপাত দেখার সৌভাগ্য একবার হয়েছিল। নিজের দেশে নয়, বিদেশের মাটিতে। কানাডায় গিয়েছি। তার খুব বড় একটা শহর টরন্টো। সেখানে থাকছি। একদিন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পের মজলিসে কথা উঠল – নায়াগ্রা দেখতে গেলে কেমন হয়, সবাই মিলে। তক্ষুনি সকলে রাজি। কোনদিন যাওয়া হবে তাও ঠিক হলো।

কোথাও যাব বললেই তো হয় না, কীভাবে যাব তা ভাবতে হয়। বাসে করে যাওয়া যায়। ঐ দেশে রাস্তা অসম্ভব ভালো। রাস্তার এখানে ওখানে গর্ত, খানা খন্দ, এসব নেই। কিন্তু বাসে চেপে গেলে নিজের ইচ্ছে মতো যেখানে সেখানে থামা যায় না। অতএব ঠিক হলো যে, কোনো বন্ধুর একটা গাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে।

তা-ই যাওয়া গেল একদিন। আমেরিকায় কিংবা কানাডায় প্রায় সকলেরই নিজের গাড়ি থাকে। আমার বন্ধুরও ছিল। এক বন্ধুরই এক বিশাল গাড়িতে একদিন চড়ে বসলাম। চলো নায়াগ্রা, চলো নায়াগ্রা। আহ্, দেশে ফিরে গিয়ে কী গল্পটাই না করা যাবে !

শাঁ শাঁ করে গাড়ি ছুটতে লাগল। কারণ ও-সব দেশে ধীরে ধীরে কেউ গাড়ি চালায় না। রাস্তাও মোটেই আঁকাবাঁকা থাকে না – রেল লাইনের মতো সোজা। ফলে দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানো সম্ভব হয়।

তা না হয় হলো, কিন্তু এত জায়গা থাকতে নায়াগ্রা দেখতেই যেতে হবে কেন ? নায়াগ্রা হলো জলপ্রপাত। জলপ্রপাত তো কখনো দেখিনি। শুধু জেনে এসেছি, ঝর্ণার মতো পাহাড়ের ওপর থেকে পানি নিচে সমতল ভূমিতে গড়িয়ে পড়ছে, তবে আকারে প্রকারে অনেক বিশাল। ঝর্ণা ছোট, আর জলপ্রপাত বড় – এটুকু যা তফাৎ। উপর থেকে নিচে জল পতনের ব্যাপার দু-জায়গাতেই ঘটছে। জল যদি না-ই পড়ে, তা হলে ঝর্ণাও হবে না, জলপ্রপাতও হবে না। কিন্তু জল যে নিচে পড়ছে, পড়ে যাচ্ছেটা কোথায় ? জলের ধর্ম তো গড়িয়ে যাওয়া। ঝর্ণার জলও গড়াতে গড়াতে ক্রমশ নদী হয়ে যায়।

এখন অন্য কথায় আসি। জলপ্রপাত দেখতে চাইব, কিন্তু পাহাড় দেখব না – একি কখনো সম্ভব ? সম্ভব নয়। কারণ পাহাড় বেয়ে জলের নিচে নামাটা না দেখে উপায় তো নেই। কিন্তু এমন জলপ্রপাত কি হতে পারে না যা পাহাড়ের ওপর থেকে পড়ছে না ? আমাদের কাণ্ডজ্ঞান বলবে – না, পাহাড় থেকেই পড়তে হবে, নইলে জলের প্রপাত বা পতন হবে কেমন করে ?

কিন্তু বিশ্ব-ভূমণ্ডল বড়ই বিচিত্র। কত অসম্ভব ব্যাপারই যে ঘটে ! পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রাকে। এই জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামে নি। সে যে কী বিস্ময়কর বলে কাউকে বোঝান সম্ভবই নয়। একমাত্র নিজের চোখে দেখলে তা বিশ্বাস হবে। ব্যাপারটা এরকম।

সমতলের ওপর দিয়ে একটি খরস্রোতা নদী বইছে। সামনের সবকিছু তো ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কই ? কিছুই তো ভাসছে না ! ভাসছে না, তার কারণ– যে মাটির ওপর দিয়ে এই খরস্রোতা নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে হঠাৎ করেই এক বিশাল ফাটল। দু দিকের মাটির মধ্যে এক বিরাট ফাঁক। একটা নদী যতখানি চওড়া হতে পারে ততখানি ফাঁক। নায়াগ্রার জল ঐ ফাঁকের ভিতরে চলে যাচ্ছে। এটাও তো প্রপাত, কারণ পানি পড়ছে। তবে, সাধারণ জলপ্রপাতের মতো পাহাড় থেকে নিচে পড়ছে না। পড়ছে সমতল থেকে বিশাল ফাটলের গহ্বরে। কিন্তু পানিটা ফাটলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে কোথায়?

নায়াগ্রা তাই একেবারে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ জেনে নিই।

কানাডা – উত্তর আমেরিকা মহাদেশের একটি দেশ। কানাডা একটি বড় দেশ।

দ্রুত গতিতে – অত্যন্ত (খুব) তাড়াতাড়ি করে, জোরে যাওয়া। আমরা দ্রুত গতিতে হাঁটতে পারি।

পতন – নিচে পড়া। মানুষের জীবনে উত্থান পতন অর্থাৎ ওপরে ওঠা ও নিচে নামার ব্যাপার সব সময়ই ঘটে থাকে। হোঁচট খেলে পতন ঠেকানো দায়।

সমতল ভূমি – যে জমি উঁচুনিচু নয়, পাহাড়ী নয়, তাকেই সমতল ভূমি বলে। ঢাকা শহর গড়ে উঠেছে সমতল ভূমিতে, কিন্তু চট্টগ্রাম শহর সেরকম নয়।

কাণ্ডজ্ঞান – স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধি। কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কেউ এত বড় ভুল করে না।

প্রবাহিত হওয়া – বয়ে চলা, গড়িয়ে গড়িয়ে চলা। নদীর জল প্রবাহিত হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়।

গহ্বর – গর্ত। পাহাড়ের গায়ে গর্ত থাকলে তাকে আমরা গহ্বর বলি।

২. শূন্যস্থান পূরণ করি।

(ক) তখন আমিও পড়েছি ----------জলপ্রপাতের কথা।
(খ) জলপ্রপাত দেখার ---------- একবার হয়েছিল।
(গ) একদিন ------ সঙ্গে গল্পের মজলিসে কথা উঠলো।
(ঘ) বাসে চেপে গেলে নিজের ---------- থামা যায় না।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

(ক) জলপ্রপাতের কথা কোথায় পড়েছ ? জলপ্রপাত কী ?
(খ) নায়াগ্রা কোথায় অবস্থিত ?
(গ) নায়াগ্রার বিশেষত্ব কী ?
(ঘ) নায়াগ্রার জল কোথায় যায় ?

৪. কথাগুলো বুঝে নিই।

জলপ্রপাত – পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে সমতল ভূমিতে বিশাল পরিধি নিয়ে জল পড়া।
মজলিস – গল্পগুজব করার আসর।
জলের ধর্ম – জলের স্বভাব, জলের চরিত্র।
বিশ্ব-ভূমণ্ডল – জগৎ, দুনিয়া।

৪. কর্ম-অনুশীলন।

আমি কোথায় কোথায় বেড়াতে বা ঘুরতে গিয়েছি– তা মনে করার চেষ্টা করি। এর মধ্য থেকে যে কোনো একটি জায়গার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর কাছে চিঠি লিখি (কোথায় গিয়েছিলাম, কবে গিয়েছিলাম, কীভাবে গিয়েছিলাম, কী কী দেখেছিলাম, কী করেছিলাম, কী খেয়েছিলাম, কেমন করে এসেছিলাম)।

দুই তীরে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি ভালোবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকাল যে নির্জনে
চকাচকির ঘর।

যেথায় ফুটে কাশ
তটের চারিপাশ,
শীতের দিনে বিদেশি সব
হাঁসের বসবাস।

কচ্ছপেরা ধীরে
রৌদ্র পোহায় তীরে,
দু-একখানি জেলের ডিঙি
সন্ধেবেলায় ভিড়ে।

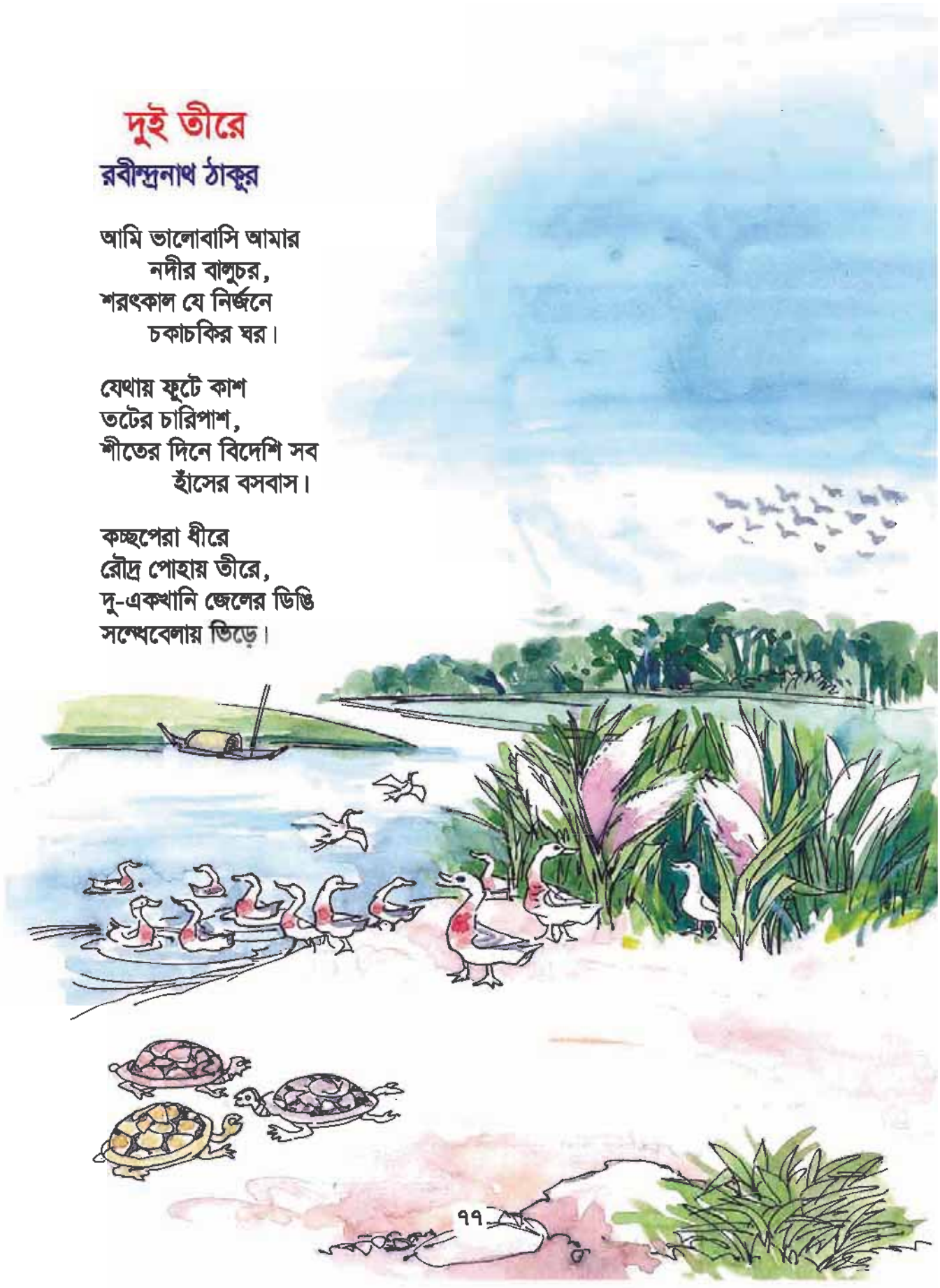

তুমি ভালোবাস তোমার
ওই ও পারের বন,
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

যেথায় বাঁকা গলি
নদীতে যায় চলি,
দুই ধারে তার বেণুবনের
শাখায় গলাগলি।

সকাল-সন্ধেবেলা
ঘাটে বধূর মেলা,
ছেলের দলে ঘাটের জলে
ভাসে ভাসায় ভেলা।

(সংক্ষেপিত)

পাঠ শিখি

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

একটি নদী, তার দুই তীরে দু-জন মানুষ বাস করে। একজন ভালোবাসে তার নদীর বালুচর, শরৎকালে চখাচখিরা যেখানে ঘর বাধে। এর তীরে তীরে ফুটে থাকে কাশফুল। শীতের সময় হাঁসেরা এসে ভীড় করে, কচ্ছপ রোদ পোহায়। সন্ধ্যায় জেলের ডিঙি এসে ভেড়ে। অন্যজন ভালোবাসে বন, যার আছে ঘন ছায়া। সেখান থেকে একটা রাস্তা সেও এসে মিশেছে নদীতে। নদীর ঘাটে বধূরা আসে, ছেলেরা জলে ভেলা ভাসায়। একটি নদী কিন্তু দুই তীরের মানুষকে কী সুন্দর মিলিয়ে দিয়েছে।

২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই ও নিজে নিজে বাক্য তৈরি করি।

নির্জন – জনশূন্য স্থান।
চকাচকি – হাঁসজাতীয় পাখি।
তট – নদীর তীর।
ডিঙি – এক ধরনের নৌকা।
আচ্ছাদন – ঢাকনি, ছাউনি।
বেণুবন – বাঁশ বাগান।
নিরবধি – অনবরত।

৩. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

তুমি ভালোবাস তোমার
ওই ও পারের বন,
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।

(ক) নদীর বালুচরে কী ঘটে ?
(খ) ওই পারের বনটি কেমন ?
(গ) সকাল সন্ধ্যা ছেলের দল কী করে ?

৫. কবিতাটি সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করি।

৬. কর্ম-অনুশীলন।

শূন্যস্থানে কথা বসিয়ে একটি কবিতা বা ছড়া লেখার চেষ্টা করি।

_____ মাস,
_____ বাঁশ।
_____ চর,
_____ ঘর।
_____ মন,
_____ বন।

কবি পরিচিতি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে, ১২৬৮ বাংলা সনের ২৫শে বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শুধু কবি নন, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, দার্শনিক, গীতিকার, সুরস্রষ্টা, চিত্রশিল্পী, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ। তাঁর রচনা ভাণ্ডার বিশাল। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট, ১৩৪৮ বাংলা সনের ২২শে শ্রাবণ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ভাবুক ছেলেটি

দশ-এগারো বছরের ছেলেটি তেমন দুরন্ত নয়। পড়াশোনায় সে ভালো, খেলাধুলাও করে। বাড়ির কাজকর্ম তেমন করতে হয় না; তবু বাবামায়ের সাথে সাথেও থাকে। তবে সময় পেলেই গাছ-গাছালি পর্যবেক্ষণ করে। রোদ বৃষ্টির ব্যাপারটাও দেখে সে। মেঘ ডেকে আকাশে বিদ্যুৎ চমকে বাজ পড়লে অবাক বিস্ময়ে ভাবে। ঝড়ে গাছপালা ভেঙে গেলে বাবাকে প্রশ্ন করে।

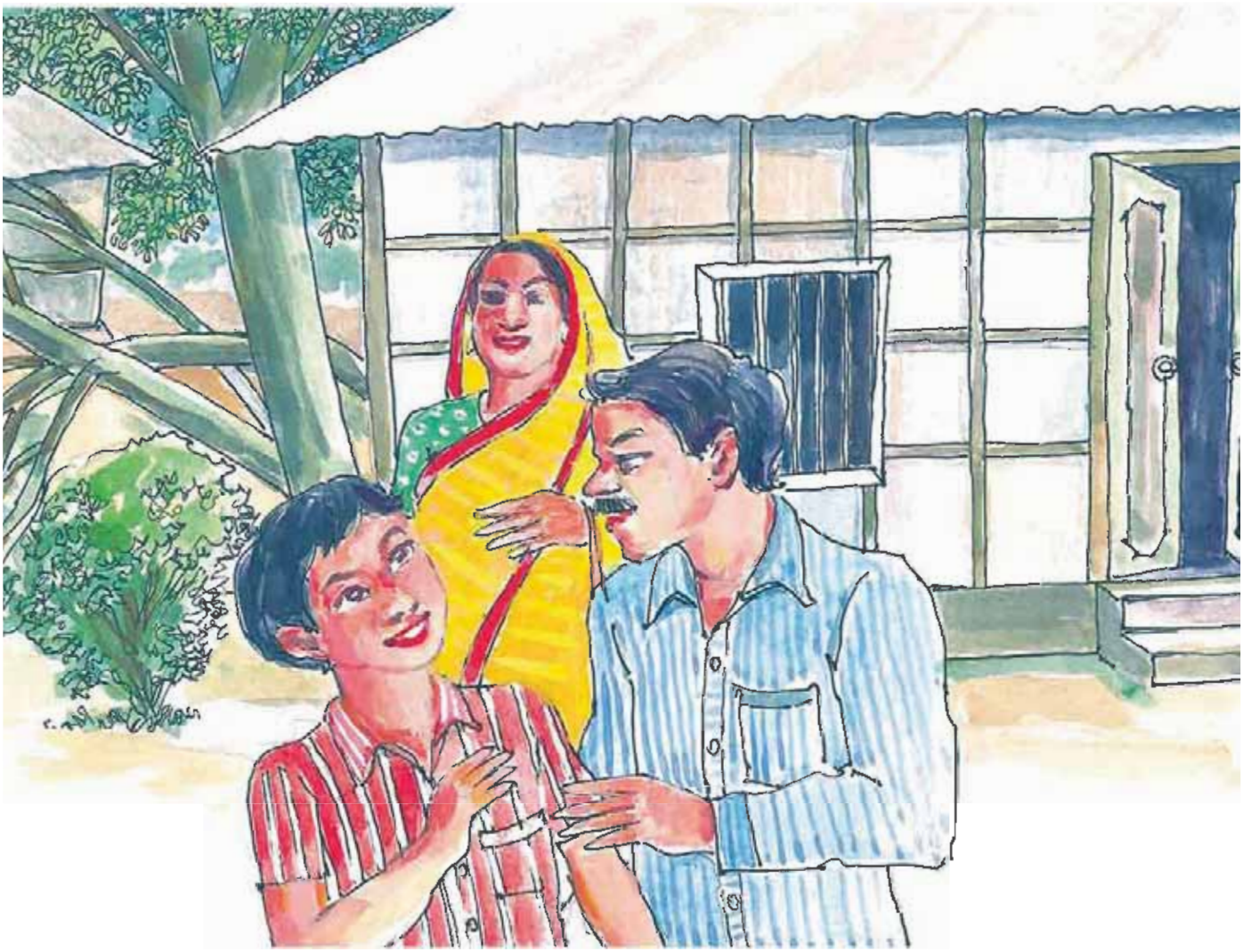

– আচ্ছা বাবা, গাছ ভেঙে গেলে, ওদেরকে কাটলে ওরা ব্যথা পায় না ?

ছেলের কথা শুনে মা হাসেন। বাবা কিন্তু হাসলেও ছেলের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন। ওর বাবা ম্যাজিস্ট্রেট হলেও আগে যে স্কুল শিক্ষক ছিলেন। ছেলেটি কিন্তু বড় হতে থাকে। প্রকৃতির অনেক কিছু নিয়েই তার নানা রকম ভাবনা আর জানার আগ্রহও বাড়তে থাকে।

যদিও বাবার দেশের বাড়ি বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে, ছেলেটির জন্ম কিন্তু ময়মনসিংহে, ১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর। ওর পড়াশোনার হাতেখড়ি হয়েছিল বাড়িতেই। তারপর প্রাথমিক স্কুলে এবং ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে শিক্ষার ধাপ পার হলে সে ভর্তি হয় কলকাতায়। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে ১৮৭৪ সালে সে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কৃতিত্বের ধারায় সে ১৮৭৮ সালে এফ.এ এবং ১৮৮০ সালে বিজ্ঞান শাখায় বি.এ পাশ করে বিলেতে যায় ডাক্তারি পড়তে।

সেই ছেলেটি বড় হয়ে প্রথম বাঙালি বৈজ্ঞানিক হিসেবে পরে জগৎবিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তোমরা অনেকেই হয়তো বুঝে ফেলেছ কে তিনি! হ্যাঁ, সেদিনকার সেই ভাবুক ছেলেটিই উত্তরকালের 'স্যার জগদীশচন্দ্র বসু'।

জগদীশচন্দ্র এক বছর ডাক্তারি পড়ার পর অধ্যাপকের পরামর্শে ১৮৮১ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। এখান থেকে ট্রাইপস্ পাশ করার পর লন্ডন থেকে বি.এসসি পাশ করেন। ১৮৮৫ সালে দেশে ফিরে এসে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। এ সময় একই পদে একজন ইংরেজ অধ্যাপক যে বেতন পেতেন ভারতীয়রা পেতেন তার তিন ভাগের দুই ভাগ। তিনি অস্থায়ীভাবে চাকরি করছিলেন বলে তাঁর বেতন আরও একভাগ কেটে নেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে তিনি দীর্ঘ তিন বছর বেতন না নিয়ে কর্তব্য পালন করেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁকে স্বীকৃতি দিয়ে সকল বকেয়া পরিশোধ করে চাকরিতে স্থায়ী করে। তখন থেকেই তিনি 'বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু' হয়ে ওঠেন। এখানে ১৮ মাস গবেষণার ফলে তিনি বেশ কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। লন্ডনের রয়েল সোসাইটির জার্নালে সে সব প্রকাশিত হয়। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় পরে তাঁকে ডি.এসসি ডিগ্রি প্রদান করে।

জগদীশচন্দ্র বসু নানা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তবে তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন 'গাছেরও প্রাণ আছে' – এই সত্য প্রমাণ করে। তিনি দেখিয়েছেন যে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর

জীবনের মধ্যে অনেক মিল আছে। তাঁর আবিষ্কারের মধ্যে গাছ বেড়ে ওঠা মাপার যন্ত্র ক্রেস্কোগ্রাফ (Crescograph) এবং গাছের দেহের উত্তেজনার বেগ মাপার সমতল তরুলিপি যন্ত্র / রিজোনাস্ট রেকর্ডার (Resonust Recorder) অন্যতম। এছাড়া তিনি খ্যাতিমান হয়েছেন অতিক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গ / মাইক্রোওয়েভ (Microwave) প্রয়োগ আবিষ্কার করে। ১৮৯৫ সালে তিনি অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি এবং কোনো তার ছাড়া তা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণে সফলতা অর্জন করেন। তারই প্রয়োগ ঘটছে আজকের বেতার, টেলিভিশন, রাডারসহ বিশ্বের অধিকাংশ তথ্যের আদান-প্রদান এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে।

মাত্র ১৮ মাসের মধ্যে করা পরীক্ষণগুলো ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের চমকে দেয়। এসবের ভিত্তিতেই বক্তৃতা দিয়ে তিনি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং জার্মানিতে খ্যাতি অর্জন করেন– যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল বিদ্যুৎ তরঙ্গ সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা। অদৃশ্য আলোক সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন বিলেতেই অধ্যাপনা করার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু দেশের কল্যাণের জন্যই তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন।

১৮৯৮ সালে তাঁর বক্তৃতার সফলতা ছিল সবচেয়ে বেশি। এর বিষয় ছিল 'বিদ্যুৎ-রশ্মির সমাবর্তন'। গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র ছিল 'বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ'। বিভিন্ন বিজ্ঞানী তখন লিখেছিলেন : এমন নির্ভুল পরীক্ষা আগে দেখা যায় নি... একজন খাঁটি বাঙালি লন্ডনে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীমণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অত্যন্ত দুরূহ বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন, আগত সকলে চমৎকৃত – এ দৃশ্য অভিনব। তাঁর আশ্চর্য সব আবিষ্কার দেখে সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন : জগদীশচন্দ্র বসুর প্রত্যেকটি আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ।

জগদীশচন্দ্র কিন্তু বাংলাতেও বেশ লিখেছেন, বিশেষ করে তোমাদের মতো শিশু-কিশোরদের জন্য। তাঁর লেখা 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি। এটি পরে 'পলাতক তুফান' নামে জগদীশচন্দ্রের 'অব্যক্ত' নামক বইয়ে ছাপা হয়। তাঁর লেখা 'অদৃশ্য আলোক' তোমাদের আনন্দ দেবে।

আমার বাংলা বই

১৯১৫ সালে ব্রিটিশ-ভারত সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধি দেন, তাই তাঁর উপাধিসহ নাম হয় 'স্যার জগদীশচন্দ্র বসু'। ১৯১৬ সালে তিনি অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের দই বছর পর প্রতিষ্ঠা করেন 'জগদীশ চন্দ্র বসু বিজ্ঞানমন্দির'। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি সেই বিজ্ঞানমন্দিরে গবেষণা পরিচালনা করেন। বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সফলতা যে গ্যালিলিও-নিউটনের সমকক্ষ তার স্বীকৃতি দেয় লন্ডনের ডেইলি এক্সপ্রেস পত্রিকা, ১৯২৭ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.এসসি ডিগ্রি প্রদান করে ১৯৩৫ সনে। জগদীশ চন্দ্র বসু গিরিডিতে মারা যান ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর।

এক দিনের সেই ভাবুক ছেলেটিই স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। একজন সফল বিজ্ঞানী। বাঙালির গৌরব।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ জেনে নিই।

পর্যবেক্ষণ – কোনো কিছু বা প্রাকৃতিক ঘটনা খেয়াল করে দেখা। নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করতে হয়।

উত্তরকালে – ভবিষ্যৎ কালে। অর্থাৎ যখনকার কথা বলা হচ্ছে তার পরবর্তী কালে। ছাত্রজীবনে ভালো করে শিক্ষালাভ করলে উত্তরকালে তা কাজে লাগে।

পান্ডিত্যপূর্ণ – জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ। বিশিষ্ট জনের বক্তৃতা পান্ডিত্যপূর্ণ হয়ে থাকে।

দুরূহ – অত্যন্ত কষ্ট করে যা করতে হয় বা বুঝতে হয়। প্রাচীন কালের পাথরের লেখা পাঠ করা দুরূহ।

বিলেত – ইংল্যান্ড। ডাক্তারি পড়ার জন্য আগে অনেকেই বিলেত যেতেন।

২. জেনে নিই।

প্রবেশিকা পরীক্ষা – আজকের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা। সেটি পাশ করলে কলেজে প্রবেশ করা যেত, তাই নাম হয়েছিল প্রবেশিকা।

এফ.এ – আজকের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা।

বিজয়স্তম্ভ – কোনো কিছু জয় করার পর যে স্তম্ভ নির্মাণ করে বিজয় ঘোষণা করা হয়।

বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি – বিজ্ঞানকে প্রধান করে এমন কাহিনি যা কল্পনা করে লেখা হয়।

গিরিডি (গিরিডিহ্) – ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যে অবস্থিত, গিরিডিহ্ জেলার প্রধান শহর। ১৮৭২ সনের আগে স্থানটি হাজারিবাগ জেলার মধ্যে ছিল।

৩. শূন্যস্থান পূরণ করি।

(ক) ছেলেটি তেমন ——————— নয়।

(খ) মেঘ ডেকে আকাশে বিদ্যুৎ চমকে বাজ পড়লে অবাক ———————ভাবে।

(গ) প্রকৃতির অনেক কিছু নিয়েই তার নানা রকম ভাবনা আর জানার ——————— বাড়তে থাকে।

(ঘ) ওর পড়াশোনার শুরু ———————।

(ঙ) প্রেসিডেন্সি কলেজে ———————অধ্যাপক পদে যোগ দেন।

(চ) প্রতিবাদে তিনি দীর্ঘ তিন বছর বেতন না নিয়ে ———————পালন করেন।

(ছ) তিনি দেখিয়েছিলেন যে, উদ্ভিদ ও ———————মধ্যে অনেক মিল আছে।

(জ) তিনি ———————তরঙ্গ সৃষ্টি এবং কোনো তার ছাড়া তা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণে সফলতা পান।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

(ক) ভাবুক ছেলেটি আসলে কে ছিল ?
(খ) সে ছোট বেলায় কী কী নিয়ে ভাবতো ?
(গ) সে কবে কোথা থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল ?
(ঘ) কখন থেকে তিনি 'বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু' হয়ে ওঠেন ?
(ঙ) তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন কোন সত্য প্রমাণ করে ?
(চ) তাঁর বক্তৃতার সফলতা সবচেয়ে বেশি ছিল কোন বিষয়ে ?
(ছ) 'তাঁর প্রত্যেকটি আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ।' – এমন কথা কোন বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছিলেন ?
(জ) 'পলাতক তুফান' নামে লেখাটির আগে কী নাম ছিল ? তাঁর কোন বইয়ে এটি ছাপা হয় ?
(ঝ) অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি কী প্রতিষ্ঠা করেন ?
(ঞ) বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সফলতাকে কোন নামকরা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ?

৫. কথাগুলো বুঝে নিই।

শিক্ষার ধাপ পার – প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় – এই সবগুলো এক একটা শিক্ষার ধাপ।

বকেয়া পরিশোধ করে – একটা সময় পরপর কারো কোনো টাকা-পয়সা পাওনা থাকলে যদি সময়মতো দেয়া না হয় তখন তা বকেয়া হয়ে যায়। পরে যদি আগের পাওনা দিয়ে দেওয়া হয় তবে তাকে বলে বকেয়া পরিশোধ করা।

জার্নালে প্রকাশিত – জ্ঞান-বিজ্ঞানের উঁচু মানের লেখা প্রবন্ধ যে পত্রিকায় ছাপা হয় সেটিকে বলে জার্নাল। জার্নালে প্রকাশিত হলে বুঝতে হবে যে সে প্রবন্ধ খুবই ভালো।

অন্যতম – বহুর মধ্যে এক হলে তাকে বলা হয় অন্যতম। কোনো কিছুকে বিশেষভাবে বোঝানোর জন্য অন্যতম শব্দটি ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের আদান-প্রদান – তথ্য বলতে আসল কথা বা সত্যকে বোঝাতো। কিন্তু, আজকের দিনে লিখে, ছাপিয়ে অথবা বেতার-টেলিভিশন–ফোন-ইন্টারনেট দ্বারা যত রকম কিছু পাওয়া যায়, পাঠানো যায় তার সবই তথ্যের আদান-প্রদান।

নাইট উপাধি – নাইট উপাধি আগের যুগে ব্রিটিশরাজের অত্যন্ত সম্মানজনক উপাধি। এঁদেরকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করতে হতো।

ট্রাইপস – তিনটি বিষয়ে একসঙ্গে ডিগ্রি অর্জন করা।

৬. কর্ম-অনুশীলন।

'বিজ্ঞান অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ'– বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি।

প্রার্থনা

গোলাম মোস্তফা

অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি
বিচার দিনের স্বামী
যত গুণগান হে চির মহান
তোমারি অন্তর্যামী।

দ্যুলোকে-ভূলোকে সবারে ছাড়িয়া
তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া
তোমারি সকাশে যাচি হে শকতি
তোমারি করুণাকামী।

সরল সঠিক পুণ্য পন্থা
মোদের দাও গো বলি
চালাও সে-পথে যে-পথে তোমার
প্রিয়জন গেছে চলি।

যে-পথে তোমার চির-অভিশাপ
যে-পথে ভ্রান্তি, চির-পরিতাপ
হে মহাচালক, মোদের কখনও
করো না সে পথগামী।

(২০১২ শিক্ষাবর্ষের চতুর্থ শ্রেণির আমার বাংলা বই থেকে গৃহীত)

পাঠ শিখি

১. জেনে নিই।

পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রেমময় ও সর্বশক্তিমান। কবি তাঁর কাছেই প্রার্থনা করছেন শক্তি ও সাহস। প্রার্থনা করছেন সরল, সঠিক ও পুণ্য পথে চলবার দিশা।

২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার শিখি।

অনন্ত – যার শেষ নেই, অশেষ। অনন্ত আকাশ এবং পৃথিবী সমস্তই সৃষ্টিকর্তার দান।
অসীম – যার সীমা নেই, সীমাহীন। পাখিরা অসীম আকাশে উড়ে বেড়ায়।
মহান – শ্রেষ্ঠ, মহৎ, উদার। আমরা সবাই মহান সৃষ্টিকর্তার গুণগান করি।
ভূলোক – পৃথিবী, মর্ত। ভূলোকের প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয়।
যাচি – প্রার্থনা করি। আমরা সৃষ্টিকর্তার শক্তি যাচি।
করুণাকামী – যে দয়া কামনা করে। আমরা সৃষ্টিকর্তার করুণাকামী।
পুণ্য – ভালো কাজ। মানুষের উপকার করা পুণ্যের কাজ।
পন্থা – পথ। সঠিক পন্থায় কাজটা করা উচিত।
অভিশাপ – অন্যের অনিষ্ট কামনা। মহৎ ব্যক্তিরা কাউকেও অভিশাপ দেন না।
পরিতাপ – দুঃখ, খেদ। ভেবে কাজ করলে পরিতাপ করতে হয় না।

৩. কথাগুলো বুঝে নিই।

প্রার্থনা – আবেদন। আমাদের জীবন সহজ ও সুন্দর হোক – সৃষ্টিকর্তার কাছে এই প্রার্থনা করি।
প্রেমময় – সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্ট জীবকে ভালোবাসেন। তাই তাঁকে প্রেমময় বলা হয়েছে।
অন্তর্যামী – সৃষ্টিকর্তা আমাদের মনের সব কথা জানেন। এ জন্য তাঁকে অন্তর্যামী বলা হয়েছে।
তোমারি সকাশে যাচি হে শকতি – সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান। তাই তাঁর কাছে আমরা শক্তি ও সাহস প্রার্থনা করি। ('শকতি' পড়তে হবে – শকোতি। শক্‌তি বা শোক্‌তি উচ্চারণ করলে ছন্দে ভুল হবে। সে জন্যই 'শক্তি' না লিখে 'শকতি' লেখা হয়েছে)।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

(ক) আমরা কার গুণগান করি এবং কার কাছে প্রার্থনা জানাই ?
(খ) 'অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি' – এই চরণ পড়ে আমরা কী বুঝি ?
(গ) আমরা কেন সৃষ্টিকর্তার কাছে করুণা ও শক্তি প্রার্থনা করি ?
(ঘ) আমরা কোন পথে চলতে চাই না ? কেন ?

৫. পরের চরণটি মিলিয়ে লিখি।

সরল সঠিক পুণ্য পন্থা

_____

চালাও সে-পথে যে-পথে তোমার

_____

৬. কবিতাটি মুখস্থ করি ও লিখি।

৭. অভিশপ্ত ও ভ্রান্ত পথে চললে আমাদের কী কী ক্ষতি হতে পারে – তা বলি ও লিখি।

৮. সৃষ্টিকর্তার নিকট আমার প্রার্থনা লিখে জানাই।

কবি পরিচিতি
গোলাম মোস্তফা

কবি গোলাম মোস্তফা ঝিনাইদহের মনোহরপুর গ্রামে ১৮৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কবি, সাহিত্যিক ও গীতিকার। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'বিশ্ব নবী', 'কাব্য কাহিনী', 'বুলবুলিস্তান', 'বনি আদম', 'গীতিসঞ্চয়ন' ইত্যাদি। ১৯৬৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

স্মরণীয় যাঁরা চিরদিন

১৯৭১ সালে আমরা অর্জন করি আমাদের স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিন আমরা দেশকে পুরোপুরি শত্রুমুক্ত করে বিজয় অর্জন করি। এই বিজয়কে পাবার আগে দেশবাসীকে করে যেতে হয় এক তীব্র মুক্তিযুদ্ধ। আমাদের সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছে শত্রুসেনাদের সঙ্গে। দেশের অন্য সব সাধারণ মানুষ তাঁদের জুগিয়েছে ভরসা ও সাহস। অপেক্ষা করেছে শত্রুর হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবার দিনটিকে পাবার জন্য। শত্রুসেনাদের দখলে থাকা আমাদের জন্মভূমিতে কোনো রকমে জীবন-যাপন করতে করতে তারা অপেক্ষা করেছে। সশস্ত্র যুদ্ধে আমাদের মুক্তিসেনারা প্রাণ দেন। আর দেশের ভেতরে অবরুদ্ধ জীবনযাপন করতে করতে প্রাণ দেন এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাঁরা ছিলেন নানা পেশার – কেউ কৃষক, কেউ মজুর, কেউ পুলিশ, কেউ সৈনিক। আরও ছিলেন ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, সরকারি কর্মকর্তা। লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশুর রক্তে ভেজা আমাদের স্বাধীনতা। তাঁদের প্রাণের বিনিময়েই আমরা আজ মুক্ত স্বাধীন দেশে, উন্নত শির নিয়ে জীবন-যাপন করে যেতে পারছি। আমরা কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে। সেই অসংখ্য মহান আত্মদানকারীদের কয়েকজনের কথা আমরা জেনে নেব।

তার আগে আমরা জেনে নিতে পারি কখন, কীভাবে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এদেশে। ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কে আমরা বলে থাকি মুক্তিযুদ্ধের কাল।

সোবিন্দচন্দ্র দেব

সেলিনা পারভীন

শিরাজউদ্দিন আহমেদ

পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ গভীর রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাকার নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষের ওপর। আক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে, ব্যারাকে ব্যারাকে, আর নানা আবাসিক এলাকায়। নির্বিচারে হত্যা করে নিদ্রিত লোক-সকলকে। সেই হত্যাকা- চালিয়েই যেতে থাকে বিরামহীন। চালিয়ে যেতে থাকে পরবর্তী নয় মাস ধরে। পাশাপাশি তারা বিশেষ রকমের হত্যাযজ্ঞ চালানোর পরিকল্পনাও করে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে একে একে হত্যা করা শুরু করে এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও বরেণ্য মানুষদের। পুরো দেশের নানা পেশার মেধাবী ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করে তারা। হত্যা পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য পাকিস্তানিরা গড়ে তোলে রাজাকার, আলবদর ও আল-শামস বাহিনী। অসাধু, লোভী, পাষণ্ড এই দেশদ্রোহীরা যোগ দেয় ওইসব বাহিনীতে। তারা পাকিস্তানি সেনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করে ওই বিশেষ হত্যা-পরিকল্পনা সফল করে তোলার জন্য।

রণদাপ্রসাদ সাহা

মুনির চৌধুরী

রাশীদুল হাসান

পঁচিশে মার্চের মধ্যরাতে শহিদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্বী শিক্ষক এম. মুনিরুজ্জামান, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব। পাকিস্তানি সেনারা সেই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতেই শুধু আক্রমণ চালায় নি, হানা দেয় তারা শিক্ষকদের বাড়িতে বাড়িতেও। বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন এম. মুনিরুজ্জামান। প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনে তিনি পবিত্র কোরান পড়া শুরু করেন। এই কোরান পাঠরত মানুষটিকেই টেনে হিঁচড়ে নিচে নামায় পাকিস্তানি সেনারা। একই বাড়ির নিচতলায় থাকতেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। ইংরেজি সাহিত্যের এই খ্যাতিমান শিক্ষককেও শত্রুসেনারা টেনে হিঁচড়ে বের করে আনে। তারপর এই দুই শিক্ষককেই গুলি

করে হত্যা করে। এ বাড়ির খুব কাছেই এক বাসায় থাকতেন ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব। দর্শন শাস্ত্রের যশস্বী শিক্ষক ছিলেন তিনি। মানুষ হিসেবে ছিলেন খুব সহজ সরল আর নিরহংকার। ওই একই রাতে তাঁকেও হত্যা করা হয়। হত্যা করে আরও কয়েকজন শিক্ষককে।

পঁচিশে মার্চ রাতে আক্রান্ত হয় সংবাদপত্র অফিসগুলোও। পাকিস্তানি শাসক ও তার সেনারা জানত যে, এদেশের সাংবাদিকেরাও তাদের জন্য বিপজ্জনক। প্রধান সংবাদপত্রগুলোর অনেক অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয় তারা সেই রাতে। হত্যা করে বহু সাংবাদিককে। এ দেশের একটি প্রধান সংবাদপত্র 'দৈনিক সংবাদ'। পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ওই পত্রিকা অফিসে আগুন লাগায়। মেধাবী লেখক ও সাংবাদিক শহীদ সাবের সে রাতে ঘুমিয়ে ছিলেন ওইখানেই। ভয়াল আগুন তাঁকে পুড়িয়ে মারে। শহিদ হন সেলিনা পারভীন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে প্রাণ দেন সাংবাদিক মেহেরুন্নেসা। কবি হিসেবেও তিনি ছিলেন সুপরিচিত। কিন্তু পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠার আগেই মৃত্যুবরণ করতে হয় তাঁকে।

পঁচিশে মার্চ এক ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের সূচনা ঘটায় তারা। ষোলই ডিসেম্বরে আমাদের বিজয় অর্জন পর্যন্ত সময় ধরে তারা এই হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যেতেই থাকে। তারা হত্যা করে প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে তিনিই প্রথম বাংলা ভাষাকে রষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেছিলেন। কুমিল্লার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে শত্রুসেনারা যখন তাঁকে হত্যা করে তখন তাঁর বয়স ছিল ৮৫ বছর। শহিদ হন অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ। জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি কাটান রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপনা ও গবেষণা করে। তিনি এ দেশবাসীর স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন আয়ুর্বেদীয় একটি প্রতিষ্ঠান। ৮৪ বছর বয়স্ক এই মানুষটিও রেহাই পান নি পাকিস্তানি শত্রুদের হাত থেকে।

এ দেশের সাধারণ মানুষদের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন রণদাপ্রসাদ সাহা। দানশীলতার জন্য লোকে তাঁকে ডাকত 'দানবীর' বলে। হত্যা করা হয় তাঁকে। চট্টগ্রামের বিখ্যাত সমাজসেবক ছিলেন নতুনচন্দ্র সিংহ। জনহিতকর নানা কাজে জীবন সমর্পণ করেছিলেন তিনি। শুত্রুসেনারা তাঁকেও রেহাই দেয়নি।

আমার বাংলা বই

একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা শহিদদের স্মরণ করে আমরা শহিদ মিনারে ফুল দিতে যাই। তখন আমাদের মনে আর মুখে বাজে এই গান – 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'। এ গানে সুর দেন আলতাফ মাহমুদ। প্রতিভাবান এই সুরসাধকেরও প্রাণ কেড়ে নেয় পাকিস্তানি বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষের দিকে তারা বুঝতে পারে যে, তাদের পরাজয় অবধারিত। তখন তারা এদেশকে আরও গভীরভাবে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়। তারা জানে এদেশের মনস্বী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সৃষ্টিশীল সকলকে হত্যা করলে এ দেশের যে ক্ষতি হবে তা অপূরণীয়। পাকিস্তানিরা আমাদের সেই অপূরণীয় ক্ষতি করার কাজ শুরু করে। রাজাকার, আলবদর, আল-শামস বাহিনীর সহায়তায় নতুন করে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বরে বিভিন্ন আবাসস্থল থেকে তারা ধরে নিয়ে যায় দেশের শক্তিমান, যশস্বী ও প্রতিভাবানদের। তারা ধরে নিয়ে যায় অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও আনোয়ার পাশাকে। তাঁরা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তুলে নিয়ে যায় ইতিহাসের অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য ও গিয়াসউদ্দিন আহমদকে। ইংরেজির অধ্যাপক রাশীদুল হাসানও বাদ পড়েন না।

শহীদুল্লা কায়সার

আনোয়ার পাশা

ফজলে রাব্বী

তুলে নিয়ে যায় প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সারকে। সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, নিজাম উদ্দীন আহমদ ও আ.ন.ম. গোলাম মোস্তফা, প্রখ্যাত চিকিৎসক ফজলে রাব্বী, আবদুল আলীম চৌধুরী, মোহাম্মদ মোর্তজাকেও একইভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। ধরে নিয়ে যাওয়া হয় আরও বহু জনকে। এঁরা কেউই আর জীবিত ফিরে আসেন নি। দেশ স্বাধীন হবার পরে এ সকল বুদ্ধিজীবীর অনেকের ক্ষত বিক্ষত লাশ পাওয়া যায় মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে। আবার অনেকের কোনো সন্ধানও পাওয়া যায় নি।

তাঁদের স্মরণে প্রতি বছর ১৪ই ডিসেম্বরে আমরা পালন করি 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে। এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন তাঁরা। তাঁদের প্রাণদান আমরা কখনো ব্যর্থ হতে দেব না। আমরা তাঁদের স্মরণ করব চিরদিন। দেশ ও মাতৃভাষার জন্য ত্যাগের মহা আদর্শ তাঁরা স্থাপন করে গেছেন। আমরা সেই আদর্শ অনুসারে নিজেদের যোগ্য মানুষ রূপে গড়ে তুলব। তবেই আমাদের পক্ষে তাঁদের ঋণ শোধ করা সম্ভব হবে।

পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ জানি ও ব্যবহার শিখি।

অবরুদ্ধ – শত্রু দিয়ে বেষ্টিত, বন্দী। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা অনেকেই বাংলাদেশে অবরুদ্ধ অবস্থায় দিন কাটিয়েছি।

আত্মদানকারী – নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে যে। এদেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মদানকারী সকল মুক্তিযোদ্ধাকে আমরা চিরদিন মনে রাখব।

নির্বিচার – কোনো রকম বিচার বিবেচনা ছাড়া। পাকিস্তানিরা নির্বিচারে এদেশের মানুষকে হত্যা করেছে।

বরেণ্য – মান্য। মুক্তিযুদ্ধকালে এদেশের অনেক বরেণ্য শিক্ষক প্রাণদান করেন।

পাষণ্ড – নির্দয়। পাষণ্ড রাজাকার বাহিনী এদেশের অনেক মানুষকে হত্যা করেছে।

অসাধু – অসৎ। অসাধু ব্যক্তি মহা বিদ্বান হলেও সে ঘৃণ্য।

মনস্বী – উদারমনা। ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব ছিলেন একজন মনস্বী শিক্ষক।

যশস্বী – বিখ্যাত, কীর্তিমান। যশস্বী মানুষদের আমরা অনুসরণ করি।

দেশদ্রোহী – দেশের শত্রু। রাজাকার, আলবদর চিরদিন গণ্য হবে দেশদ্রোহী হিসেবে।

অবধারিত – অনিবার্য, যা হবেই। পাকিস্তানিরা বুঝেছিল যে, তাদের পরাজয় অবধারিত।

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

(ক) কোন সময়কে মুক্তিযুদ্ধের কাল বলা হয় ?
(খ) ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যরা কী করেছিল ?
(গ) রাজাকার আলবদর কারা? তারা কী করত ?
(ঘ) কে, কখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান ?
(ঙ) শহীদ সাবের কে ছিলেন? তিনি কীভাবে শহিদ হন ?
(চ) রণদাপ্রসাদ সাহাকে কেন দানবীর বলা হয় ?
(ছ) কয়েকজন শহিদ সাংবাদিকের নাম বলি ও তাঁদের সম্পর্কে লিখি।
(জ) কোন দিনটিকে 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে পালন করা হয় ? কেন ?
(ঞ) আমরা কাদের চিরিদিন স্মরণ করে যাব ? কেন ?
(ট) আমরা কীভাবে শহিদদের ঋণ শোধ করতে পারি ?

৩. এককথায় প্রকাশ করতে শিখি।

বরণ করার যোগ্য	–	বরেণ্য
মেধা আছে এমন যে জন	–	মেধাবী
অহংকার নেই যার	–	নিরহংকার
বিচার-বিবেচনা ছাড়া যা	–	নির্বিচার
কোনোভাবেই পূরণ করা যায় না এমন	–	অপূরণীয়

৪. বিপরীত শব্দ বলি ও লিখি।

ঘুমন্ত, নিরস্ত্র, স্বাধীন, সাধু, লোভী, সরল, কল্যাণ, শ্রেষ্ঠ, পূর্ণ, ব্যর্থ।

ফুটবল খেলোয়াড়

জসীম উদ্‌দীন

আমাদের মেসে ইমদাদ হক ফুটবল খেলোয়াড়
হাতে পায়ে মুখে শত আঘাতের ক্ষতে খ্যাতি লেখা তার।
সন্ধ্যাবেলায় দেখিবে তাহারে পটি বাঁধি পায়ে হাতে,
মালিশ মাখিছে প্রতি গিঁটে গিঁটে কাৎ হয়ে বিছানাতে।
মেসের চাকর হয় লবেজান সেঁক দিতে ভাঙা হাড়ে,
সারা রাত শুধু ছটফট করে কেঁদে কেঁদে ডাক ছাড়ে।
আমরা তো ভাবি ছ-মাসের তরে পঙ্গু সে হলো হায়,
ফুটবল-টিমে বল লয়ে কভু দেখিতে পাব না তায়।

প্রভাত বেলায় খবর লইতে ছুটে যাই তার ঘরে,
বিছানা তাহার শূন্য পড়িয়া ভাঙা খাটিয়ার 'পরে।
টেবিলের পরে ছোট বড় যত মালিশের শিশিগুলি,
উপহাস যেন করিতেছে মোরে ছিপি-পরা দাঁত তুলি।

সন্ধ্যাবেলায় খেলার মাঠেতে চেয়ে দেখি বিস্ময়ে,
মোদের মেসের ইমদাদ হক আগে ছুটে বল লয়ে !
বাম পায়ে বল ড্রিবলিং করে ডান পায়ে মারে ঠেলা,
ভাঙা কয়খানা হাতে পায়ে তার বজ্র করিছে খেলা।
চালাও চালাও আরো আগে যাও বাতাসের মতো ধাও,
মারো জোরে মারো – গোলের ভিতরে বলেরে ছুঁড়িয়া দাও।
গোল-গোল-গোল চারিদিক হতে ওঠে কোলাহলকল,
জীবনের পণ, মরণের পণ, সব বাধা পায়ে দল।
গোল-গোল-গোল – মোদের মেসের ইমদাদ হক কাজি,
ভাঙা দুটি পায়ে জয়ের ভাগ্য লুটিয়া আনিল আজি।
দর্শকদল ফিরিয়া চলিছে মহা-কলরব করে,

ইমদাদ হক খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসে যে মেসের ঘরে।
মেসের চাকর হয়রান হয় পায়েতে মালিশ মাখি,
বেঘুম রাত্র কেটে যায় তার চিৎকার করি ডাকি।

সকালে সকলে দৈনিক খুলি মহা-আনন্দে পড়ে,
ইমদাদ হক কাল যা খেলেছে কমই তা নজরে পড়ে।

আমার বাংলা বই

পাঠ শিখি

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

এক মজার বন্ধুর কথা বলা হয়েছে এই কবিতায়। জাত খেলোয়াড় ইমদাদ হক। খেলা এবং খেলায় জেতাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। নিজের অবস্থা যেমনই হোক না কেন খেলা-পাগল সে, খেলবেই। খেলতে গিয়ে তার নিজের শারীরিক অবস্থা যাই হোক না কেন জেতাটাই আসল। খেলতে গিয়ে ইমদাদ কত শত আঘাত পায়। তবু সেসব কষ্টকে পরোয়া না করে সে খেলে এবং তার জন্যই খেলায় জিত আসে। সকল দর্শক খেলার আনন্দ তার জন্যই পায়। এই কবিতায় খেলাচ্ছলে একটি আদর্শকে তুলে ধরা হয়েছে। নিজের যতটুকু যোগ্যতা তার সবটুকু দিয়ে মানুষ যদি একান্তভাবে কিছু করে, তবে অন্য সকলের জন্যও সে বড় কিছু করতে পারে।

২. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই এবং নিজে নিজে বাক্য তৈরি করি।

ক্ষত – শরীরের কাটা স্থান বা আঘাত পাওয়া স্থান।

পটি – কাপড়ের লম্বা টুকরা। এটা দিয়ে শরীরের কোনো স্থান বাঁধা থাকে; পট্টি।

মালিশ – যে অষুধ চেপে-চেপে শরীরে লাগাতে হয়, মালিস।

ড্রিবলিং – এটা ফুটবল খেলার একটি কৌশল। ইংরেজি dribble শব্দের অর্থ হলো পায়ে-পায়ে বল গড়িয়ে নিয়ে কৌশলে বল কাটিয়ে নিয়ে যাওয়া।

বজ্র – ভীষণ শব্দ করে ঝড়ের আকাশে বিদ্যুৎ প্রকাশ পাওয়া, বাজ।

কোলাহলকল – কোলাহল হলো অনেক মানুষের শোরগোল, গোলমাল। আর 'কল' বলতে বোঝায় মানুষের গলার সুন্দর আওয়াজ। এখানে খেলায় সকলে এক সঙ্গে গোল-গোল চিৎকার করলে বেশ ভালো শোনায় বলে 'কোলাহলকল' বলা হয়েছে।

মহা-কলরব – কলরব শব্দের অর্থ অনেক মানুষের গলায় এক সাথে চেঁচামেচি, আওয়াজ। মহাকলরব অর্থ হয় ভীষণ চিৎকার, চেঁচামেচি।

৩. খালি জায়গায় কবিতার ঠিক লাইনটি লিখি।

ক. ————————————————, সারা রাত শুধু ছটফট করে কেঁদে কেঁদে ডাক ছাড়ে।

খ. টেবিলের পরে ছোট বড় যত মালিশের শিশিগুলি, ———————————— ————— ।

গ. গোল-গোল-গোল – মোদের মেসের ইমদাদ হক কাজি, ———————————— ——————— ।

৪. ইমদাদ হক সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখি।

৫. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৬. কর্ম-অনুশীলন।

(ক) 'আমার প্রিয় খেলা' নিয়ে একটি রচনা লিখি।

(খ) ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়ার সাময়িক ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একটা আবেদনপত্র লিখি।

কবি পরিচিতি জসীম উদ্‌দীন	কবি জসীম উদ্‌দীন ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে তিনি কবিতা লেখেন। তাঁর কবিতায় পল্লিজীবন বেশি উঠে এসেছে বলে তিনি 'পল্লিকবি' নামে খ্যাত হয়েছেন। তবে জসীম উদ্‌দীন ছোটদের জন্যও অনেক সুন্দর কবিতা ও গদ্য রচনা করেছেন। তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনি ও আত্মজীবনী অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর কবিতা 'কবর', কাব্যগ্রন্থ 'নকশী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', ছোটদের জন্য লেখা 'ডালিম কুমার', 'হাসু' ও 'এক পয়সার বাঁশি' বিখ্যাত। তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই মার্চ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

মাটির নিচে যে শহর

বাংলাদেশের মধ্যে বেশ কয়েকটা প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে। সে সব স্থানের নাম তোমরা হয়তো জানো, যেমন– ময়নামতি, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর। এগুলোর কোনোটি হয়তো তুমি দেখেও থাকবে। সেগুলো সবই মাটির উপরে, টিবির আকারে, তাই সহজে দূর থেকেই দেখা যায়। কিন্তু এদেশে মাটির নিচে রয়ে গিয়েছিল এক প্রাচীন নগর-সভ্যতা। আজকে সেটার কথাই বলব।

কুমিল্লার লালমাই আর বরেন্দ্র অঞ্চল দিনাজপুর-নওগাঁ-বগুড়ার পাহাড়পুর এবং মহাস্থানগড়ের মতো মধুপুর গড় থেকে টাঙ্গাইল-গাজীপুর-নরসিংদীর অধিকাংশ ভূমির গঠন একই রকম যা মধুপুর গড় নামে পরিচিত। মৃত্তিকা বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, এই অঞ্চলের মাটি হাজার-হাজার বছরের পুরানো। তুমি ধরেই নিতে পার যে, আজ থেকে বহু-বহু বছর আগে আমাদের এই দেশের ভূপৃষ্ঠ ঠিক এই রকম ছিল না। আসলে, খ্রিস্টপূর্ব সাত থেকে ছয় শতকে বর্তমানের গঙ্গা নদীর তীরে সুসভ্য জন-মানুষের বসতি ছিল। এখানে ছিল সুন্দর নগরী। মানচিত্রে দেখতে পার। এখনকার নরসিংদী দিয়ে বয়ে গেছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ। ১৭৭০ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র প্রবাহ ময়মনসিংহ পেরিয়ে বেলাবর কাছে দক্ষিণ দিকে গিয়ে প্রাচীন সোনারগাঁ নগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল।

সম্ভবত বড় ভূমিকম্প, বন্যা-প্লাবন আর নদীভাঙনের কারণে কোনো সময়ে এসব অঞ্চলে ভূপ্রকৃতির বড় রকমের ওলট পালট ঘটে। ১৮৯৭ সালের প্রচণ্ড ভূমিকম্পের কথা অনেকেই জানেন। আজকের যত মাঠ-ঘাট, নদী-নালা আর জনবসতি তার সবই প্রাকৃতিক কারণে বদলে গেছে। এখনো তোমরা দেখবে নদীর পাড়ের জমি, ঘরবাড়ি, গ্রাম আর রাস্তা-ঘাট ভাঙছে। আবার বিশাল নদীর অন্য দিকে বিস্তীর্ণ চর পড়ছে। শত শত বছর আগে থেকেই এইভাবে চলে আসা ভাঙা-গড়ায় মাটিচাপা পড়ে যায় এক একটি নগর-জনপদ। মাটি খুঁড়ে এমনি এক সুপ্রাচীন নগর-জনপদের দেখা পাওয়া গেছে বাংলাদেশে। সেই স্থানের নাম উয়ারী-বটেশ্বর।

উয়ারী-বটেশ্বর ঢাকা থেকে ৭০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে নরসিংদীর বেলাব ও শিবপুর উপজেলায় অবস্থিত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান।

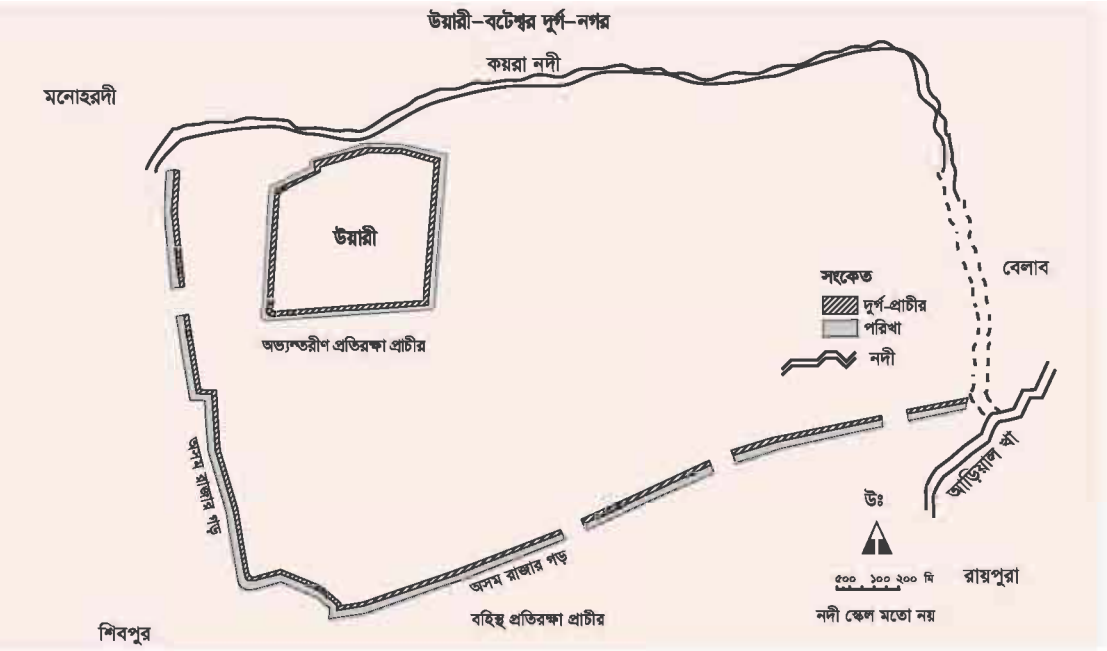

আসলে উয়ারী এবং বটেশ্বর পাশাপাশি দুটি গ্রাম। এই দুই গ্রামে প্রায়ই বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া যেত। ১৯৩৩ সনে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খনন করার সময় একটা পাত্রে জমানো কিছু মুদ্রা পায়। স্থানীয় স্কুলশিক্ষক মোহাম্মদ হানিফ পাঠান সেখান থেকে ২০-৩০টি মুদ্রা সংগ্রহ করেন। এগুলো ছিল বঙ্গদেশের এবং ভারতের প্রাচীনতম রৌপ্যমুদ্রা। সেটাই ছিল উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহের প্রথম চেষ্টা। তিনি তাঁর ছেলে হাবিবুল্লা পাঠানকে এ সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। ১৯৫৫ সালে বটেশ্বর গ্রামের শ্রমিকরা দুটি লৌহপিণ্ড ফেলে যায়। ত্রিকোণাকার ও একমুখ চোখা ভারী লোহার পিণ্ডগুলো হাবিবুল্লাহ বাবাকে নিয়ে দেখালে তিনি অভিভূত হন। ১৯৫৬ সালে উয়ারী

আমার বাংলা বই

গ্রামের মাটি খননকালে ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রার একটি ভাণ্ডার পান। তাতে চার হাজারের মতো মুদ্রা ছিল। ১৯৭৪-৭৫ সালের পর থেকে হাবিবুল্লাহ উয়ারী-বটেশ্বরের প্রচুর প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করে জাদুঘরে জমা দেন। অনেক পরে ২০০০ সনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে শুরু হয় খনন কাজ। খনন করে পাওয়া যায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গ-নগর, ইটের স্থাপত্য, বন্দর, রাস্তা, গলি, পোড়ামাটির ফলক, মূল্যবান পাথর,পাথরের বাটখারা, কাঁচের পুঁতি, মুদ্রাভাণ্ডার। মুদ্রাগুলো ভারত উপমহাদেশের মধ্যে প্রাচীনতম। এ থেকে বিশেষজ্ঞদের ধারণা মাটির নিচে থাকা এই স্থানটি প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরানো।

আজকের উত্তরে মনোহরদি ও বেলাব, পূর্বে রায়পুরা, দক্ষিণে শীতলক্ষ্যা নদী – এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল সুসভ্য মানুষজনের বসবাস, ছিল নগর সভ্যতা। পূর্ব-দক্ষিণ দিক দিয়ে ভৈরবের মেঘনা হয়ে এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য সুদূর জনপদ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল বলে মনে হয়। ঐতিহাসিকদের ধারণা, ব্রহ্মপুত্র নদ হয়ে, বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগরের অঞ্চলের সুদূর রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত 'উয়ারী-বটেশ্বর' রাজ্যের যোগাযোগ হয়তো ছিল।

পাথর মুদ্রা

উয়ারী-বটেশ্বরের আশেপাশে প্রায় ৫০টি পুরানো জায়গা পাওয়া গেছে। আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম, যেমন– রাঙারটেক, সোনারুতলা, কেন্দুয়া, মরজাল, টঙ্গীরাজার বাড়ি, মন্দিরভিটা, জানখাঁরটেক, টঙ্গীরটেকে প্রাচীন বসতির চিহ্ন পাওয়া যায়। দুর্গ-প্রাচীর, ইটের স্থাপত্য, মুদ্রা, গহনা, ধাতব বস্তু, অস্ত্র থেকে শুরু করে জীবনধারণের মত প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে তা থেকে সহজেই বলা যায়, এখানকার মানুষ যথেষ্ট সভ্য ছিল। এই স্থানের বসতি এলাকাটি সম্ভবত রাজ্যের রাজধানী ছিল।

অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের ধারণা, অত্যন্ত সমৃদ্ধশীল আর সঠিক পরিকল্পনায় গড়া এই সভ্যতা প্রাচীন কালে 'সোনাগড়া' নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত ছিল।

কাঁচের পুঁতি

উয়ারী-বটেশ্বর এলাকার মাটির নিচটিকে একটি নগরী হিসেবে ধরা যেতে পারে। এটি দুর্গ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল যাকে আবার রাজধানী হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। প্রায় ৬০০ মিটার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের আয়তনের এই দুর্গ-নগরটি ছিল নানা দিক থেকে বিশিষ্ট। খুব পাকা প্রকৌশলীগণ এটি গড়ে থাকবেন। বাইরের কেউ যেন আক্রমণ করে দখল করতে না পারে সে রকম শক্ত ব্যবস্থা দেখা যায়। এখানে প্রাপ্ত লোহা ও ধাতু, মূল্যবান পাথর এবং অন্যান্য ব্যবহারের জিনিসপত্র থেকে বোঝা যায়, এই অঞ্চলের মানুষের জীবন ছিল যথেষ্ট উন্নত।

উয়ারী-বটেশ্বর থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শিবপুর উপজেলার মন্দিরভিটায় এক বৌদ্ধ পদ্মমন্দিরও আবিষ্কৃত হয়েছে। জানখারটেকে একটি বৌদ্ধবিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক আশ্চর্য সব নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে এই এলাকা থেকে।

পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই।

প্রত্নতাত্ত্বিক – প্রত্ন শব্দের অর্থ অতি পুরাতন বা প্রাচীন। এই সম্পর্কিত যে তত্ত্ব তাকে বলা হয় প্রত্নতত্ত্ব। তবে, প্রাচীন কালের জিনিসপত্র, মুদ্রা, অট্টালিকা ইত্যাদি বিচার করে এবং ইতিহাস খুঁজে যা বের করা হয় বা যেভাবে বের করা হয় তাকে বলে প্রত্নতাত্ত্বিক।

উপত্যকা – দুই উঁচু স্থান, পাহাড় বা পর্বতের মাঝখানের সমতল ভূমি বা নিচু ভূমি অথবা পাহাড়-পর্বতের পাশের ভূমি।

জনপদ – যেখানে অনেক জন-মানুষ এক সাথে বসবাস করে, লোকালয়, শহর।

প্রাচীনতম – প্রাচীন হলো পুরাতন বা বহুকাল আগের কিছু। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলে 'তম' যোগ করা হয়।

অভিভূত – ভাবাবিষ্ট বা আচ্ছন্ন হয়ে পড়া।
নিদর্শন – প্রমাণ, চিহ্ন বা উদাহরণ।
খ্রিস্টপূর্ব – যিশুখ্রিস্টের জন্মের পূর্বের বৎসর বোঝাতে বলা হয় খ্রিস্টপূর্ব, আর তাঁর জন্মের পরের বছরগুলোকে বলা হয় খ্রিস্টাব্দ। খ্রিস্টাব্দ যত কম হয় ততই পুরানো, কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব যত বেশি হয় ততই পুরানো হয়।
ঐতিহাসিক – যাঁরা ইতিহাস লেখেন বা ভালো জানেন। ইতিহাসে স্থান লাভের যোগ্য বা ইতিহাস-ভিত্তিক হলেও তাকে ঐতিহাসিক বলা হয়।

২. বিশেষভাবে লক্ষ করি।

ছাপাঙ্কিত – ছাপ হলো দাগ বা চিহ্ন দেওয়া। কোনো কিছুর উপর ছাপ দিয়ে অঙ্কন করা হলে বলা হবে ছাপাঙ্কিত। দুটি – শব্দ ছাপ + অঙ্কিত মিলে হয়েছে ছাপাঙ্কিত। এই রকম দুই শব্দের মিলন হলে তাকে বলে সন্ধি। যেমন, নীল + আকাশ = নীলাকাশ। বাংলাদেশের মুদ্রার উপর শাপলা ফুল ছাপাঙ্কিত আছে।

৩. শূন্যস্থান পূরণ করি।

(ক) এদেশে ———————— রয়ে গিয়েছিল এক প্রাচীন নগর-সভ্যতা।
(খ) এখনকার নরসিংদী ও ভৈরবের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে পুরনো ———————— ।
(গ) এক সুপ্রাচীন ———————— দেখা পাওয়া গেছে বাংলাদেশে।
(ঘ) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ———————— এর নেতৃত্বে শুরু হয় খনন কাজ।
(ঙ) উয়ারী-বটেশ্বরের আশে-পাশে প্রায় ———————— জায়গা পাওয়া যাচ্ছে।
(চ) উয়ারী-বটেশ্বর এলাকার মাটির নিচটিকে একটি ———————— হিসেবে ধরা যেতে পারে।
(ছ) শিবপুর উপজেলার ধুপিরটেকে এক ———————— আবিষ্কৃত হয়েছে।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

(ক) উয়ারী-বটেশ্বর বলে যা শোনা যায় তা আসলে কী ?
(খ) এটি কত বছর আগের এবং তা সেরকম হলো কী করে ?
(গ) ব্রহ্মপুত্র নদ আগে কোথা দিয়ে প্রবাহিত হতো আর এখন কোথায় ?
(ঘ) কোন কোন নিদর্শন থেকে উয়ারী-বটেশ্বরের সময়কাল জানা যায় ?
(ঙ) উয়ারী-বটেশ্বরকে কারা কীভাবে পরিচিত করিয়ে তোলেন ?

৫. কর্ম-অনুশীলন।

বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে রচনা লিখি।

হিমালয়ের শীর্ষে বাংলাদেশের পতাকা

তখন কেবল সূর্য উঠছে, পূর্ব দিগন্তে লাল সূর্য। এরকম একটা মুহূর্তে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকাকে এভারেস্টের শীর্ষে উড়িয়ে দিলেন এক তরুণ। নাম তাঁর মুসা ইব্রাহিম। সেই প্রথম কোনো বাংলাদেশীর এভারেস্ট বিজয়। দিনটা ছিল ২৩শে মে, ২০১০ সাল। সময় ভোর ৫টা ৫৫ মিনিট।

ছেলেবেলা থেকেই মুসার স্বপ্ন ছিল দুর্লঙ্ঘনীয় ঐ পাহাড়চূড়ায় ওঠার। মুসার বয়স তখন মাত্র নয় বছর। বাবা-মায়ের সঙ্গে ঠাকুরগাঁয়ে থাকে। একদিন বাবা তাকে ঐ শহরের এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেলেন যেখান থেকে এভারেস্টের কিছুটা অংশ দেখা যায়।

মুসা তো অবাক! কত উঁচু, গম্ভীর, স্তব্ধ এই পাহাড়! বুকের মধ্যে একটু একটু করে স্বপ্নটা ডানা মেলে যেন উড়তে চাইল। কিন্তু ঐ পাহাড়-শীর্ষে ওঠার কথাটা ভাবা যত সহজ, বাস্তবে ওঠা তো তত সহজ নয়। বড় হয়ে একথা বুঝতে তার এতটুকু কষ্ট হয়নি। কিন্তু স্বপ্ন না থাকলে মানুষ বড় হবে কী করে? অজানাকে জয় করবে কী করে?

মুসা ভর্তি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে। এখানে পড়াশোনা করতে এসে বুকের মধ্যে পুষে রাখা স্বপ্নটা তাই ডানা ঝাপটাতে শুরু করল। অভিযানকে কীভাবে শিক্ষার অংশ করে তোলা যায়, এই ভাবনাতেই দিন কাটছিল তাঁর। মনে মনে ঠিক করলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্ব সাঙ্গ করেই ঐ অভিযানে বেরিয়ে পড়বেন।

কিন্তু কোনো কিছু জয় করতে চাইলেই তো আর জয় করা যায় না। এর জন্যে চাই কঠোর সাধনা আর প্রস্তুতি। মুসাও সেভাবেই শুরু করলেন। সেটা ২০০৭ সালের কথা। মুসা গড়ে তুললেন একটি প্রতিষ্ঠান – নর্থ আলপাইন ক্লাব। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হলো পাহাড়ে ওঠার খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া। মুসা নিজেও গ্রহণ করলেন এই প্রশিক্ষণ। ছোটখাটো দু-একটা পাহাড়ে উঠে এভারেস্টে ওঠার প্রাথমিক প্রস্তুতিও সেরে ফেললেন তিনি। কিন্তু এভারেস্টের চূড়ায় ওঠা বলে কথা! এ পর্যন্ত খুব বেশি মানুষ তো এভারেস্টের শীর্ষে উঠতে পারেননি। উচ্চতাও তো এর কম নয় – ২৯,০৩৫ মিটার। মুসা যখন ভাবছিলেন এভারেস্ট জয় করবেন, তখন পর্যন্ত এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে পেরেছিলেন পৃথিবীর ২০টি দেশের মাত্র তিন হাজারের বেশি কিছু মানুষ। শুধু প্রশিক্ষণ নিলেও আবার হবে না। প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। সেই টাকা তিনি পাবেন কোথায়? কিন্তু অসীম সাহসী আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই তরুণ তো হেরে যাবার পাত্র নন। পারিবারিক সঞ্চয় আর দু-একটি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় শুরু হলো তাঁর এভারেস্ট অভিযান।

৮ই এপ্রিল, ২০১০ সাল। নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকা ত্যাগ করলেন। সেখানে পৌঁছে অভিযানের জন্যে যা-যা প্রয়োজন, কিনে ফেললেন সেইসব জিনিস। পরদিন সঙ্গী শেরপাদের নিয়ে পৌঁছালেন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২ হাজার ফুট উঁচু তিব্বতের নয়লামে। এই এলাকাটি সাধারণ কোনো জায়গা নয়। এখানে মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে যে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়, তার পরিমাণ কম। সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর শারীরিক সমস্যা – মাথাব্যথা। কয়েক দিন এখানে থেকে কিছুটা ধাতস্থ হওয়ার পর উঠে এলেন টিংরিতে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৪ হাজার ফুট উঁচুতে জায়গাটির অবস্থান। অক্সিজেনের পরিমাণ এখানে আরও কম, বেঁচে থাকা আরও কিছুটা কঠিন।

আমার বাংলা বই

পরদিন ১৪ই এপ্রিল। শেরপাদের নিয়ে তিনি পৌঁছুলেন প্রথম বেস ক্যাম্পে। ক্যাম্পটির অবস্থান ১৭ হাজার ফুট উচ্চতায়। এই ক্যাম্প থেকেই আসলে এভারেস্টের চূড়ায় ওঠার কাজটি শুরু করতে হয়। মুসার মনে পড়ে গেল, আজ তো পহেলা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষের

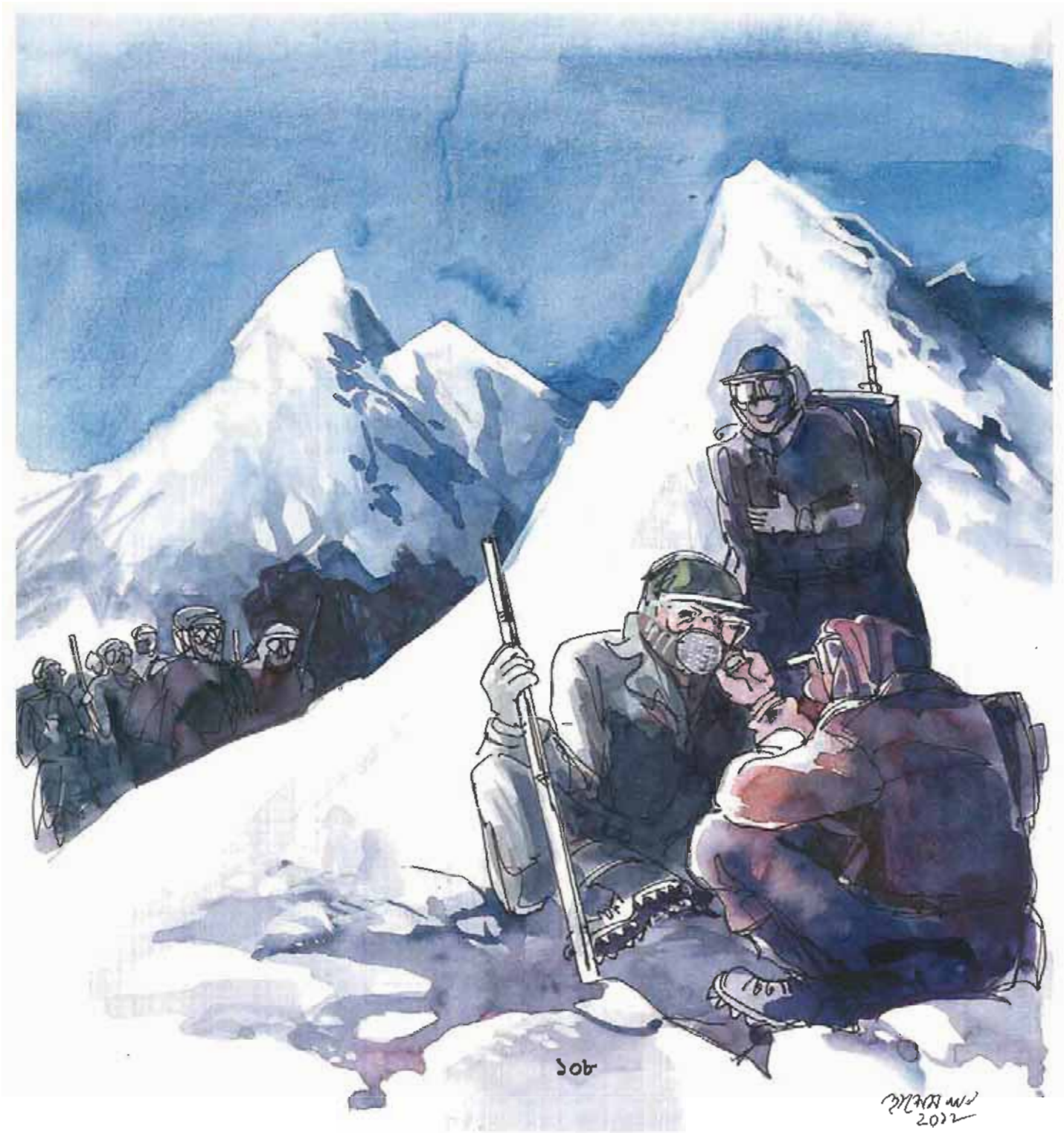

প্রথম দিন। কী আনন্দ আর উল্লাসের ভিতর দিয়েই-না নববর্ষ উদ্‌যাপন করছে সবাই। বিস্ময়কর হচ্ছে ঐ দিনটি ছিল আবার নেপালি নববর্ষেরও প্রথম দিন। মুসা ভাবলেন, শুরুটা মন্দ হবে না তাহলে। বেস ক্যাম্প থেকেই এভারেস্টের চূড়াটা দেখা যায়। মুসা জানিয়েছেন, "চূড়া থেকে আমরা তখন ১০০ কিলোমিটার দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছি। মনে হলো হাত বাড়ালেই বুঝি ছুঁয়ে দিতে পারবো। আমারও তখন তর সইছিল না।" ফলে মাত্র চারদিন অপেক্ষা করে মধ্যবর্তী বেস ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। ১৮ই এপ্রিল তাঁরা সেখানে এসে পৌঁছুলেন। মাত্র একদিন থেকে পরদিনই আবার অগ্রবর্তী বেস ক্যাম্পে উঠতে থাকলেন। এই বেস ক্যাম্পটি ৬৪৫০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। এই উচ্চতায় মুসার মাথা-ব্যথা আরও বেড়ে গেল। "মাথাব্যথার জন্য আমি একেবারে ঘুমুতে পারছিলাম না। খাবার রুচি গিয়েছিল কমে, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছিল"– মুসা পরে সেই সময়ের অভিজ্ঞতার কথা এভাবেই বর্ণনা করেছেন। "কিন্তু এভারেস্টে ওঠার সময় এসব ভাবলে, অর্থাৎ মনঃসংযোগে সামান্য বিচ্যুতি ঘটলে মৃত্যু অবধারিত। ফলে, শরীর যতই দুর্বল হোক, মানসিকভাবে আমি শক্ত থাকার চেষ্টা করছিলাম।" মুসা এইসময় এমন একটা বরফের দেয়াল পেরুচ্ছিলেন, যেটা অতিক্রম করা ছিল সত্যি কঠিন। এরপর তিনি শেরপাদের সহায়তায় এসে পৌঁছুলেন ৭,১০০ মিটার উঁচু ১ নম্বর ক্যাম্পে। কিন্তু মুসা তখন বেশ ক্লান্ত, শরীরের শক্তিও কমে গেছে। শেরপাদের পরামর্শে এবার তিনি ফিরে এলেন অগ্রবর্তী বেস ক্যাম্পে। লক্ষ্য – বিশ্রাম, আহার আর অক্সিজেন গ্রহণ করে চূড়ায় ওঠা।

কয়েকদিন পরে আবার শুরু করলেন অভিযান। এবারও শেরপারা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বেস ক্যাম্পে ফিরে যেতে বললেন। এভাবে বারবার অভিযান বাধাগ্রস্ত হওয়ায় মুসা দারুণ হতাশ হয়ে পড়েন। অবশেষে তৃতীয় বার যখন তাঁরা আবার ওঠা শুরু করলেন তখন আরম্ভ হল তীব্র তুষারঝড়। ঝড়টা এত তীব্র ছিল যে মুসাদের আশ্রয়ের জন্যে তৈরি তাঁবু উড়িয়ে নিতে চাইছিল। একপর্যায়ে মুসার মনে হলো অভিযান বন্ধ করে ফিরে আসবেন সমতলে। অন্য একটা দলের কয়েক জন অভিযাত্রিকের মৃত্যু হয়েছে, ওয়াকিটকির মাধ্যমে এমন খবরও তাঁর কানে এলো। কিন্তু এরপর এলো সেই দিন, শুরু হলো চমৎকার একটা দিন। দিনটা ছিল ১৬ই মে। আবার যাত্রা, এবার গন্তব্য একেবারে শীর্ষে পৌঁছানো। ১৯শে এপ্রিল শুরু হলো চূড়ান্ত অভিযান। কিন্তু আবহাওয়া তখনও খুব ভালো নয়। ঝড়ে মুসার অক্সিজেনের ব্যাগটি একবার ফুটো হয়ে যায়। মুসার এইসময় মনে হচ্ছিল, তিনি বুঝি মারা যাচ্ছেন। তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে শেরপারা ব্যাগটা মেরামত করে ফেলেন, আর প্রাণে বেঁচে যান মুসা।

আমার বাংলা বই

এবার এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। পেরুতে হবে শেষ খাঁড়ি। মুসা তখন ভীষণ উদ্দীপ্ত, তাঁর আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। স্বপ্ন তাঁর প্রায় হাতের মুঠোয়। সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিয়ে শুরু করলেন চূড়ান্ত অভিযান। ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। চোখে পড়ল অনেক পেছনে আরও একটা দল টর্চ জ্বালিয়ে এগিয়ে আসছে চূড়ার দিকে। তাঁর মনে হলো আকাশে যেন নক্ষত্রেরা ঝিকিমিকি করছে। স্বাগত জানাচ্ছে নতুন এই অভিযাত্রীকে। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। প্রায় শীর্ষ পৌঁছে গেছেন এমন একটা সময়ে তিনি শুয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর ঠিক পেছনেই ছিলেন একদল অস্ট্রেলীয় অভিযাত্রী। তাঁরা তাঁকে টেনে তোলেন, অক্সিজেনের পাত্রটা ঠিক করে দেন, শুকনো খাবার আর পানি খেতে দিয়ে তাঁকে বাঁচান। এবার তিনি পৌঁছে গেলেন পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গায়, এভারেস্টের চূড়ায়। উড়িয়ে দিলেন বাংলাদেশের পতাকা।

একদিন যে চূড়া জয়ের অভিযান শুরু হয়েছিল এডমন্ড হিলারি আর তেনজিং নরগে-কে দিয়ে, তারই শীর্ষে এখন বাংলাদেশের মুসা ইব্রাহিম। সাতান্ন বছর পরে বাংলাদেশের কোনো অভিযাত্রীর শীর্ষজয়। তবে শীর্ষে ওঠাটা যেমন কঠিন, নামাটা ছিল তার চেয়ে আরও কঠিন। তাই খুব ধীরগতিতে সমভূমিতে নেমে আসেন তিনি। ফিরে আসেন স্বদেশে।

সেই শুরু। এরপর বাংলাদেশের প্রথম নারী পর্বতারোহী হিসেবে এভারেস্ট জয় করেন নিশাত মজুমদার। দুবার এর চূড়ায় ওঠেন এম এ মুহিত। অন্য আরেক নারী ওয়াফসিয়া নাজরীনও প্রায় একই সময়ে জয় করেন এভারেস্ট।

শৈশবে যে স্বপ্ন মুসা এবং অন্যেরা দেখেছিলেন, দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতি, অধ্যবসায় আর আত্মবিশ্বাসের ওপর ভর করে তাঁরা তাতে সফলতা অর্জন করলেন। বুঝিয়ে দিলেন, বাঙালি এক সাহসী জাতি, বীরের জাতি, অজানাকে সে জয় করতে পারে।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই ও ব্যবহার শিখি।

এভারেস্ট – হিমালয় পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়া। সকল পর্বতারোহী স্বপ্ন দেখে এভারেস্টে ওঠার।

দুর্লঙ্ঘনীয় – যাকে লঙ্ঘন বা অতিক্রম করা কঠিন। দুর্লঙ্ঘনীয় কোনো কিছুকে জয় করাই বীরের ধর্ম।

সাঙ্গ – পরিসমাপ্তি , শেষ। পড়াশোনা সাঙ্গ করেই আমি দেশের জন্য কাজ করব।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ – প্রতিজ্ঞা পূরণে যার সঙ্কল্প দৃঢ়। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কোনো কাজ না করলে সেই কাজে সফলতা আসে না।

ধাতস্থ হওয়া – স্থির, শান্ত, মানিয়ে নেওয়া। হঠাৎ করে সে নতুন জায়গায় এসেছে, ধাতস্থ হতে তো একটু সময় লাগবেই।

শেরপা – নেপালের অধিবাসী। এরা এভারেস্ট অভিযানে সাহায্য করে। শেরপাদের সহায়তায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ এভারেস্ট জয় করতে পেরেছেন।

অগ্রবর্তী – সামনের দিকে থাকেন যারা। অগ্রবর্তী দলের সদস্য হিসেবে মুসা সবার আগে হিমালয়ের পাদদেশে পৌঁছেছিলেন।

অভিযাত্রিক – যে অভিযান করে। দুঃসাহসিক অভিযাত্রিক হিসেবে মুসা ইব্রাহিম এভারেস্ট জয় করেন।

মাহেন্দ্রক্ষণ – বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। অবশেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যখন মুসা জয় করলেন এভারেস্ট।

উদ্দীপ্ত – উজ্জীবিত, প্রাণিত। ফুটবল খেলায় জয় লাভ করে ছেলেরা তখন ভীষণ উদ্দীপ্ত।

ওয়াকিটকি – একধরনের বৈদ্যুতিক বেতারযন্ত্র যার মাধ্যমে স্বল্প দূরত্বে তথ্য আদান প্রদান করা যায়। পুলিশ ওয়াকিটকি ব্যবহার করে তথ্য আদান প্রদান করে।

২. ব্যাখ্যা করি।

(ক) পূর্ব দিগন্তে লাল সূর্য।

(খ) স্বপ্নটা ডানা মেলে যেন উড়তে চাইল।

(গ) বুকের মধ্যে পুষে রাখা স্বপ্ন।
(ঘ) বাঙালি এক সাহসী জাতি, বীরের জাতি, অজানাকে সে জয় করতে পারে।

৩. বিপরীত শব্দ লিখি।

স্বপ্ন –
দুর্লঙ্ঘনীয় –
স্তব্ধ –
বাস্তবে –
গ্রহণ –
সমস্যা –
বিশ্রাম –
আরম্ভ –

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) ছেলেবেলায় মুসা ইব্রাহিমের মধ্যে কীভাবে এভারেস্ট জয়ের স্বপ্ন জেগেছিল ?
(খ) এভারেস্ট জয় করার জন্য মুসা কী রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন ?
(গ) তিব্বতের নয়লামে ওঠার পর মুসার শারীরিক অবস্থা কেমন হয়েছিল ?
(ঘ) ২০১০ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখটি মুসার কাছে কী কারণে বিশেষ একটি দিন বলে মনে হয়েছিল ?
(ঙ) মুসা কত বার অভিযানে বিরতি দিয়েছিলেন এবং কেন ?
(চ) কোনো কিছু জয় করার জন্য কিসের প্রয়োজন হয় সবচেয়ে বেশি ?

৫. কর্ম-অনুশীলন।

(ক) বাংলাদেশের প্রথম নারী পর্বতারোহী নিশাত মজুমদারের এভারেস্ট জয় সম্পর্কে জানি, বলি ও লিখি।

(খ) আমার পড়া বা অন্য কারো নিকট থেকে শোনা কোনো আভিযান সম্পর্কে বলি ও লিখি।

রৌদ্র লেখে জয়

শামসুর রাহমান

বর্গি এল খাজনা নিতে,
মারল মানুষ কত।
পুড়ল শহর পুড়ল শ্যামল
গ্রাম যে শত শত।

হানাদারের সঙ্গে জোরে
লড়ে মুক্তি-সেনা,
তাদের কথা দেশের মানুষ
কখনো ভুলবে না।

আবার দেখি নীল আকাশে
পায়রা মেলে পাখা,
মা হয়ে যায় দেশের মাটি,
তার বুকেতেই থাকা।

কাল যেখানে আঁধার ছিল
আজ সেখানে আলো।
কাল যেখানে মন্দ ছিল,
আজ সেখানে ভালো।

কাল যেখানে পরাজয়ের
কালো সন্ধ্যা হয়,
আজ সেখানে নতুন করে
রৌদ্র লেখে জয়।

পাঠ শিখি

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতি জয়লাভ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। আগে এ দেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা জয়ী হয়েছিলেন। এই কবিতায় পাকিস্তানিদের অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কেন এদেশের সন্তানেরা সংগ্রাম করেছিল সে-কথাও বলা হয়েছে।

২. নিচের শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই ও ব্যবহার শিখি।

বর্গি – মারাঠা দস্যু। বহু পূর্বে বাংলায় বর্গি এসে হানা দিত, মানুষ মারত, ধনসম্পদ লুট করত।

হানাদার – আক্রমণকারী। হানাদারদের পরাজিত করেই মুক্তিযোদ্ধারা এ-দেশকে স্বাধীন করেছিলেন।

খাজনা – কর বা ট্যাক্স। সরকারকে খাজনা দেওয়া সকল নাগরিকের কর্তব্য।

৩. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

(ক) বর্গি এল খাজনা নিতে, মারল মানুষ কত। – এখানে 'খাজনা নিতে' অর্থ লুটতরাজ করতে। বর্গিরা বাংলাদেশে এসে মানুষ মেরে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বাঙালির ধনসম্পদ নিয়ে পালিয়ে যেত।

(খ) তাদের কথা দেশের মানুষ কখনো ভুলবে না। – মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মানুষ কখনো ভুলবে না, কারণ তারাই হানাদার পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদেরকে এদেশ থেকে তাড়িয়েছিল।

(গ) মা হয়ে যায় দেশের মাটি, তার বুকেতেই থাকা। – মা ও মাতৃভূমি সমান গর্বের, সমান আনন্দের। জননীহীন সন্তান যেমন দুর্ভাগা, যার মাতৃভূমি নেই সেও তেমনি ভাগ্যহীন।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।

(ক) বর্গি কারা? তারা কী করেছিল ?
(খ) হানাদারদের কথা মানুষ কেন ভুলবে না ?
(গ) 'কাল যেখানে আঁধার ছিল আজ সেখানে আলো।'–কথাটি ব্যাখ্যা করি।

৫. নিচের শব্দের বিপরীত শব্দগুলো জেনে নিই।

আঁধার	–	আলো
কালো	–	সাদা
ভালো	–	মন্দ
জয়	–	পরাজয়
নতুন	–	পুরাতন
সকাল	–	সন্ধ্যা

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও প্রথম আট চরণ না দেখে লিখি।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য কোনো কবিতা বা ছড়া পড়ে তা শ্রেণিতে আবৃত্তি করি।

কবি পরিচিতি
শামসুর রাহমান

কবি শামসুর রাহমান ১৯২৯ খিস্টাব্দের ২৩শে অক্টোবরে পুরনো ঢাকার মাহুতটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস নরসিংদী জেলা পাড়াতলী গ্রামে। তিনি দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের একজন প্রধান কবি। ছোটদের জন্য তিনি অনেক ছড়া, কবিতা ও স্মৃতিকথা লিখেছেন। 'এলাটিং বেলাটিং', 'ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো', 'স্মৃতির শহর ঢাকা' ইত্যাদি ছোটদের জন্য লেখা তাঁর বিখ্যাত বই। তিনি ১৭ই আগস্ট ২০০৬ তারিখে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

অপেক্ষা

সেলিনা হোসেন

রুমা আর রুবা দুই বোন। ওদের ভীষণ ভাব। একসঙ্গে স্কুলে যায়। এক সঙ্গে খেলে। খুব কমই ঝগড়া হয় ওদের।

রুমার বয়স বারো। আর রুবার দশ।

দুই জনের জন্মদিন নিয়ে ওদের বাবা-মায়ের এক একটি গল্প আছে। ওদের মা রাহেলা বলে যেদিন রুমার জন্ম হয় সেদিন বাড়ির উঠোনের শিউলি গাছটা ফুলে ফুলে ভরে ছিল। এত ফুল নাকি আর কখনো দেখেনি রাহেলা বানু। খুশবু ছড়িয়ে গিয়েছিল চারদিকে।

রুবা উদগ্রীব হয়ে বলে, মা আমার গল্পটা বল।

তোর গল্পটা আমি বলব, মা। এ কথা বলে জসীম মিয়া মেয়েকে জড়িয়ে ধরে। বলে, যেদিন তুই হলি সেদিন আমি বাড়ির বাইরের আমগাছটার নিচে বসে আছি। হঠাৎ মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখি আমের বোলে ভরে আছে গাছটা। এত বোল আসতে দেখিনি আগে। বোলের গন্ধে চারদিক ভরে গেছে।

দুই বোন বাবা-মায়ের আদরের ছায়ায় বড় হয়। স্কুলে যাওয়ার পথে বুনোফুল ছিঁড়ে বেণীর সঙ্গে গেঁথে রাখে। ফড়িং ধরে। আবার আকাশে উড়িয়ে দেয়। ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে খাতার ভেতর চাপা দিয়ে রাখে। শুকিয়ে গেলে বাবার কপালে লাগিয়ে দিয়ে বলে, বাবা তোমার হাজার বছর আয়ু হোক। মায়ের কপালে লাগিয়ে দিয়ে বলে, মা তোমার ভাতের হাঁড়ি ভরা থাকুক।

জসীম মিয়া ওদের কপালে চুমু দিয়ে বলে, আমার মেয়েগুলোর অনেক বুদ্ধি। অনেক বড় হ মা। চাইলে লেখাপড়ার জন্য তোদের আমি ঢাকা পাঠাব।

দুই বোন খুশিতে হাততালি দেয়। বাবা-মা ওদের উৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একদিন জসীম মিয়া বাজার থেকে দুই কেজি চাল-ডাল কিনে বাড়ি ফিরে বারান্দায় ধপাস করে বসে পড়ে। ছুটে আসে রাহেলা বানু।

– কী হয়েছে ?

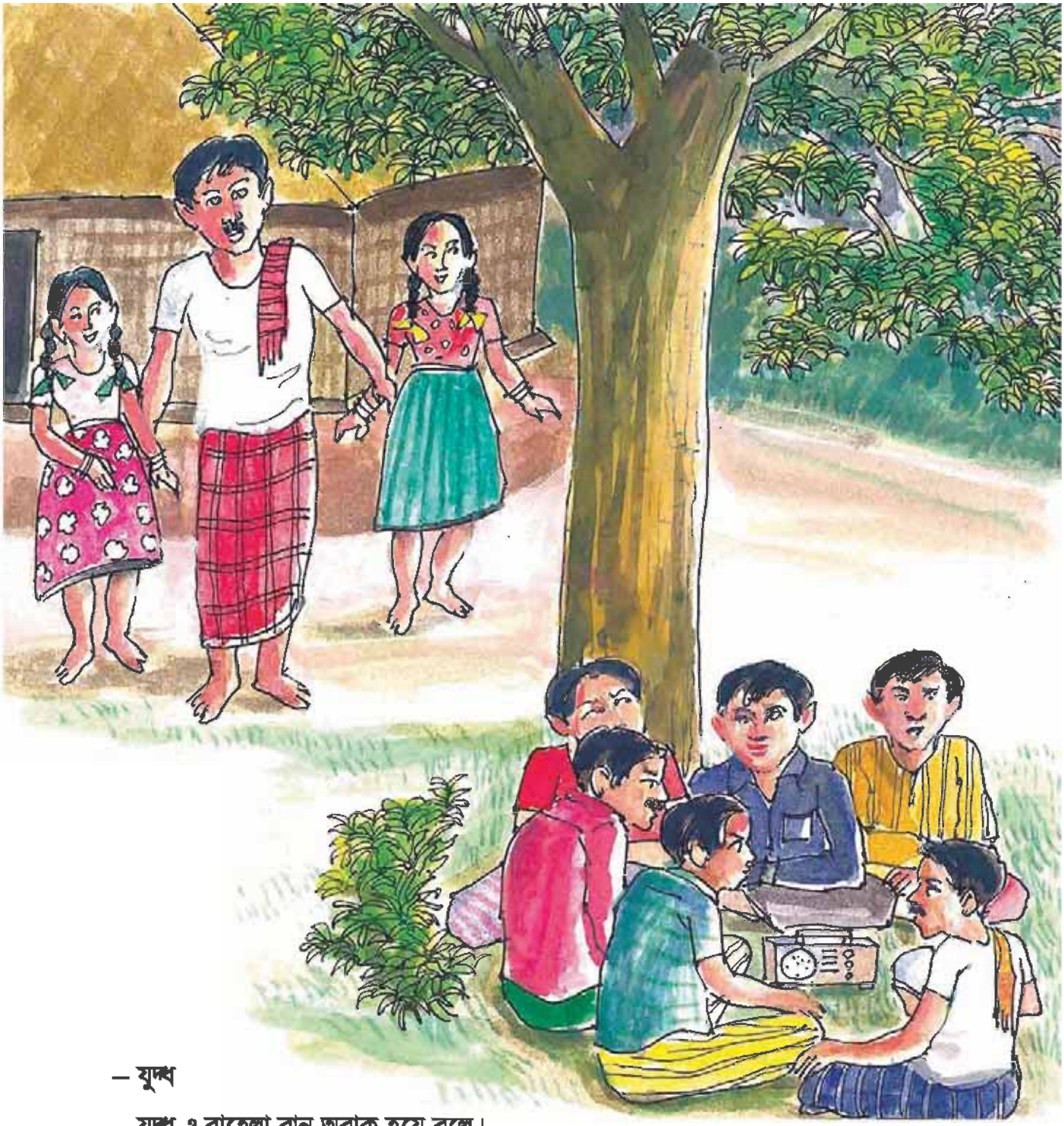

– যুদ্ধ

– যুদ্ধ ? রাহেলা বানু অবাক হয়ে বলে।

– কিছু বলার আগেই জসীম শুনতে পায় বাইরে হইচই। ও দুই মেয়ের হাত ধরে বাইরে আসে। দেখে লোকজন আমগাছের নিচে গোল হয়ে বসে রেডিওতে খবর শুনছে। বিবিসির খবর। বলছে, ঢাকা শহরে গত মধ্যরাতে গণহত্যা শুরু করেছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী।

আমার বাংলা বই

জসীমের মনে পড়ে কিছুদিন আগে ওরা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শুনছিল– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

লোকজন খবর শুনে উত্তেজিত হয়ে বলে, আমাদের সবাইকে যুদ্ধ করতে হবে।

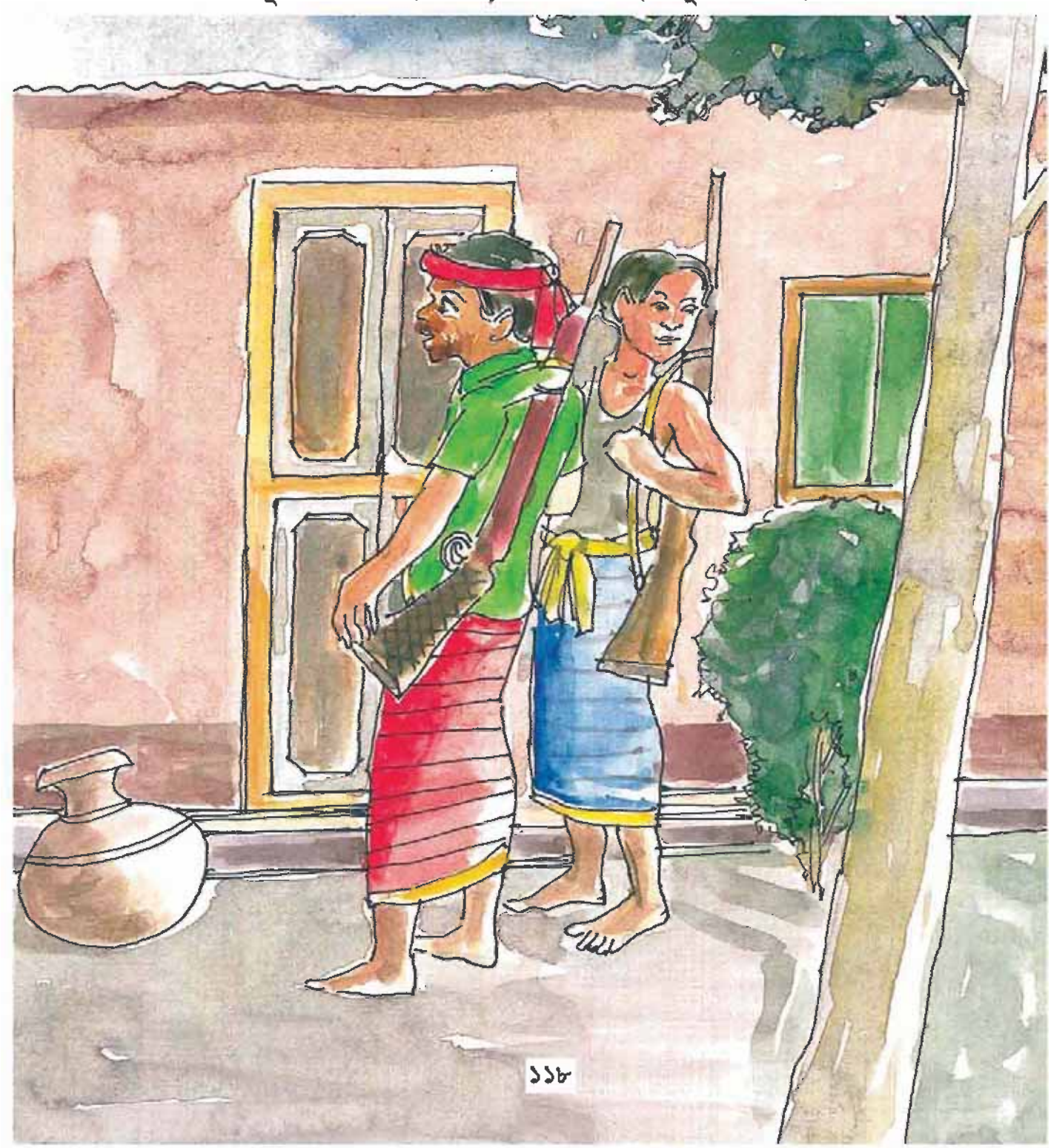

রুমা-রুবা বাবার হাত ছাড়িয়ে অন্য ছেলেমেয়েদের কাছে যুদ্ধের কথা বলার জন্য ছুট দেয়। চিৎকার করে বলে, – যুদ্ধ করতে হবে রে। যুদ্ধ যুদ্ধ।

কয়েক মাস পরে গাঁয়ে মিলিটিরি আসে। জসীম শহর থেকে আসা ছেলেদের কাছ থেকে রাইফেল চালান শিখে নেয়। তারপর গড়ে তোলে মুক্তিবাহিনী। রাহেলা মেয়েদের নিয়ে বাড়িতে থাকবে। জসীম চেয়েছিল রাহেলা ওর বাবার বাড়ি চলে যাক, কিন্তু রাহেলা যেতে রাজি হয়নি।

নদীর ধারেই বাজার। সেদিন বিকেলে বাজারে গেলে পাকিস্তানি মিলিটিরির সামনে পড়ে যায় জসীম। ওরা বাজারের দোকান আর ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসে। একটি বুলেট এসে লাগে জসীমের বুকে। নদীর ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় ও। রক্তে ভেসে যায় মাটি। নিজেরই রক্তে মাখামাখি হয়ে যায় ওর শরীর।

মিলিটারিরা চলে গেলে যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারা ঘরে ফিরে আসে। রাহেলাও মেয়েদের নিয়ে আসে বাড়িতে। অনেক বাড়ি পুড়ে গেলেও ওদের বাড়িতে আগুন লাগেনি। বড় আমগাছটা ঘরের চাল আড়াল করে রেখেছে বলে আগুন এখানে আসতে পারেনি।

রাহেলা সারা রাত জসীমের জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু জসীম বাড়ি ফেরে না। রুমা-রুবা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে যায়।

পরদিন গাঁয়ের লোকেরা জসীমের লাশ নিয়ে আসে বাড়িতে। রুমা-রুবা কিছুক্ষণ বাবাকে দেখে নিশ্চুপ হয়ে যায়। যেন ওরা কথা বলা ভুলে গেছে। রাহেলা তো বারবার জ্ঞান হারাচ্ছে। গাঁয়ের মেয়েরা ওদের মাকে দেখাশোনা করছে। দুই বোন রান্নাঘরের দরজায় চুপ করে বসে থাকে।

রুবা রুমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলে, যুদ্ধ মানে কী বুবু ?

রুমা দুই হাতে চোখ মুছে বলে, বাবার মরে যাওয়া।

দুই জন আকাশের দিকে তাকায়। অনেক দূরে কালো ধোঁয়ার মতো কিছু একটা আকাশের দিকে উঠছে। উঠছে তো উঠছেই।

আমার বাংলা বই

ওরা বুঝতে পারে পাশের গ্রামে আগুন দিয়েছে মিলিটারি।

দুই বোন হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। দুই জনেই বুঝতে পারে যুদ্ধ মানে কী।

ঘোর বর্ষা। বৃষ্টির তোড়ে ডুবে যায় মাঠঘাট। রাহেলা বানু শুকনো মুখে বারান্দায় বসে থাকে। দুই বোন ধানখেতের আলের পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া পানি থেকে কুঁচো চিংড়ি ধরে আনে। ওদের মা অন্যের বাড়ি থেকে আনা চালে ভাত রান্না করে।

দুমুঠো চাল মাটির কলসিতে জমিয়ে রাখে রাহেলা বানু। রাতে কোনো মুক্তিযোদ্ধা এলে তার জন্য ভাত রান্না করবে। দুই বোন শুকনো লাকড়ি কুড়িয়ে এনে রান্নাঘরে জমিয়ে রাখে। যদি লাকড়ির দরকার হয় তখন কী দিয়ে ভাত রান্না করবে মা? দুই বোন অধীর অপেক্ষায় থাকে।

সে রাতে বৃষ্টি ছিল না। মরা জ্যোৎস্নায় ভরা ছিল উঠোন।

গভীর রাতে দুই জন মুক্তিযোদ্ধা আসে ওদের বাড়িতে।
চুপিচুপি ডাকে মা, দরজা খোলো মাগো–

ধড়মড়িয়ে ওঠে রুমা – কে ডাকে ? ও ঠেলে মাকে জাগায়।

– মা ওঠো। শোন, কেউ এসেছে।

রাহেলা বানু টুকটুক শব্দ শুনে দরজার কাছে গেলে আবার শুনতে পায় সে ডাক, মা দরজা খোল।

রাহেলা কাঁপা হাতে দরজা খুললে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।
ওদের একজন বলে, ট্রেনিংয়ের সময় জসীম কাকু আমাদের বলেছিলেন দরকার হলে যেন আপনার কাছে আসি।

মা, আপনি আমাদের চিনবেন না। আমাদের খিদে পেয়েছে। ভাত খেয়েই চলে যাব।

– কোথায় যাবে ? রুমা জিজ্ঞেস করে।
– নদীর ওপারে। ওখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প আছে।
– তোমরা যুদ্ধ করবে ? রুবা জানতে চায়।

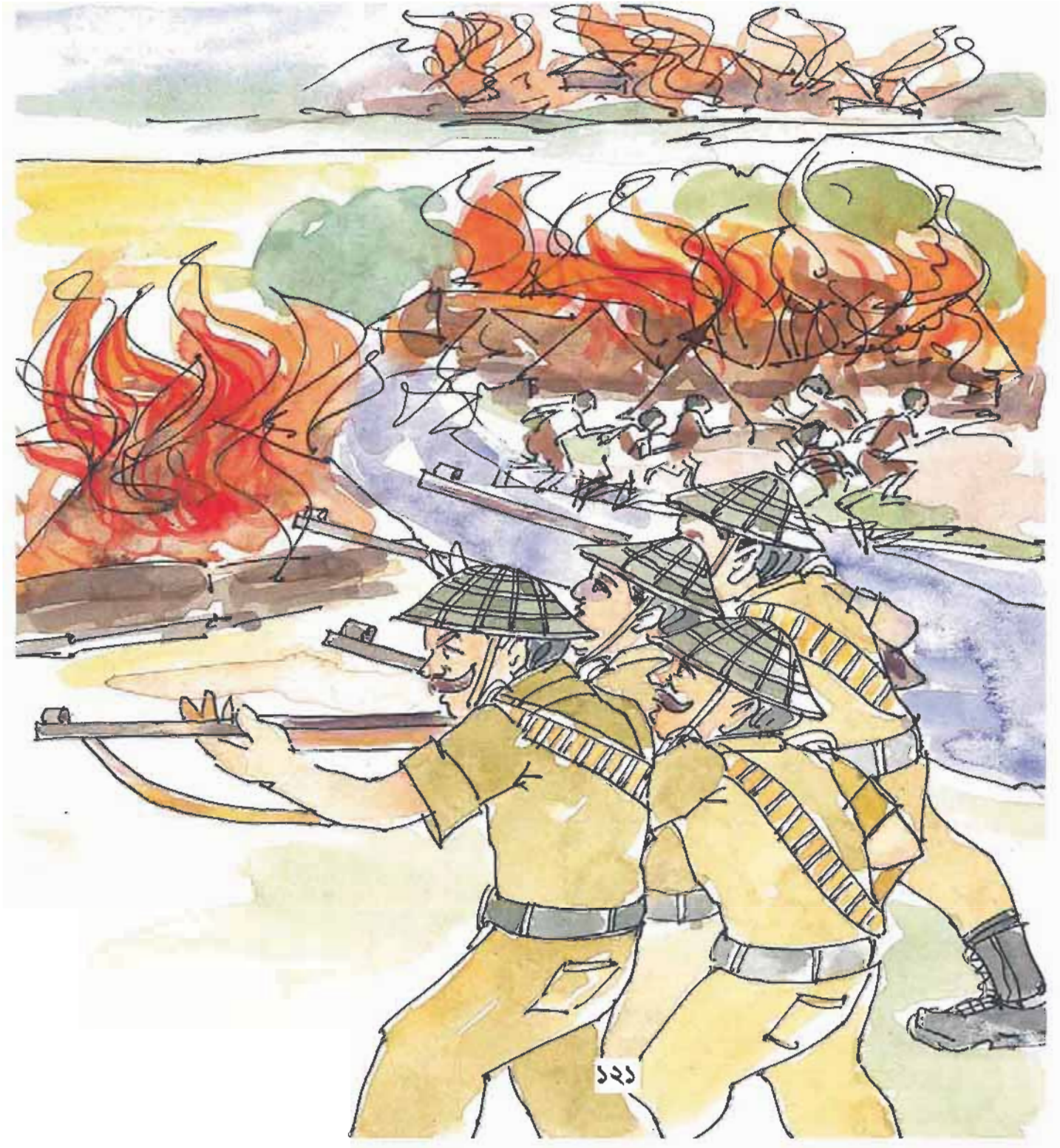

– হ্যাঁ, আমরা পাকিস্তানি মিলিটারির ক্যাম্প আক্রমণ করব।
– তোমাদের রাইফেল গুলো ছুঁয়ে দেখি? রুমা গভীর আবেগে বলে।
– হ্যাঁ, দেখ।

দুজনে দুবোনের কোলে রাইফেল দুটো দিয়ে দেয়। রাইফেল দুটো ওরা কোলে নিয়ে বসে থাকে। মা রান্না চড়ায়। কিছুক্ষণ পর রাহেলা গরম ভাত নিয়ে আসে গামলা ভরে। সঙ্গে ডিম-আলুর তরকারি। যোদ্ধা দুই জন গপগপিয়ে খায়। দেরি করার সময় নেই। নদীর ঘাটে ওদের জন্য নৌকা নিয়ে বসে আছে অন্যরা। দেরি করা চলবে না। খাওয়া শেষ হলে রাহেলা বলে – তোমরা আবার আসবে তো ?

দরকার হলে আসতে পারি। নইলে অন্যেরা আসবে। কেউ না কেউ আসবে।

রাহেলা বানুকে সালাম করে দুই বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে চলে যায় মুক্তিযোদ্ধারা।

বর্ষা শেষ।

আশ্বিনের শিউলি ফোটার দিন শুরু হয়েছে।

একদিন দরজায় টুকটুক শব্দ হয়।

– খুকুমণিরা দরজা খোল।

দুই বোন লাফ দিয়ে উঠে দরজা খোলে। মুক্তিযোদ্ধারা আসে। ভাত খায়। নয়তো একটু ঘুমিয়ে নেয়। রাতের অন্ধকারে আবার চলে যায়।

ঘোরতর যুদ্ধ চলছে চারদিকে।

রুমা আর রুবা রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না।

ওরা আবার অপেক্ষা করে একটি ডাক শোনার জন্য,

– খুকুমণিরা দরজা খোল, আমরা মুক্তিযোদ্ধা।

(২০১২ শিক্ষাবর্ষের পঞ্চম শ্রেণির আমার বাংলা বই থেকে গৃহীত)

পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই এবং বাক্য তৈরি করে পড়ি ও লিখি।

খুশবু – সুগন্ধ।
উদ্গ্রীব – খুব আগ্রহী। ব্যগ্র।
বিবিসি – যুক্তরাজ্যের বেতার কেন্দ্রের নাম।
গণহত্যা – অনেক লোককে বিনা অপরাধে মেরে ফেলা।
বঙ্গবন্ধু – জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের উপাধি।
ট্রেনিং – কোনো বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া বা নেওয়া, প্রশিক্ষণ।
গপগপিয়ে – গপগপ করে।
মুক্তিবাহিনী – শত্রুর দখল থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করেছিল যে সেনাদল।
মুক্তিযোদ্ধা – যিনি স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেন।
ক্যাম্প – সৈনিক বা যোদ্ধাদের অস্থায়ী ঘাঁটি। সেনাছাউনি।
মিলিটিরি – সামরিক বাহিনী। গল্পে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বোঝানো হয়েছে।

২. নিচের বাক্যাংশ ও বাক্যগুলো পড়ি।

ধপাস করে পড়া – হঠাৎ ধপ করে পড়া। একটা আম ধপাস্ করে পড়ল।
মুখ থুবড়ে পড়া – উপুড় হয়ে বা হুমড়ি খেয়ে পড়া। ছেলেটা হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।
গপগপিয়ে খাওয়া – একসঙ্গে বেশি খাবার মুখে পুরে খাওয়া। সে গপগপিয়ে সব ভাত খেয়ে ফেলল।

৩. ডানপাশ থেকে শব্দ এনে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের সারিতে সাজাই।

বিশেষ্য	বিশেষণ	শব্দ	শব্দ
.....	.....	গাছ	ভাত
.....	.....	শুকনো	ভীষণ
.....	.....	নদী	কাঁপা

আমার বাংলা বই

.....	.....	দরজা	রাইফেল
.....	.....	গরম	গভীর
.....	.....	হাঁড়ি	দ্রুত

৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করি।

জন্মদিন, আয়ু, অপেক্ষা, মুক্তিযোদ্ধা।

৫. বিপরীত শব্দ লিখি।

জন্ম, কান্না, ভরা, যুদ্ধ, দূর, শুকনো। যেমন :

শব্দ		বিপরীত শব্দ
জন্ম	–	মৃত্যু
কান্না	–	
ভরা	–	
যুদ্ধ	–	
দূর	–	
শুকনো	–	

৬. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ থেকে দুটি লাইন পড়ি ও লিখি।

‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’

৭. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) রুমার জন্মদিনের গল্পটি কী ?
(খ) রুবার জন্মদিনের গল্পটি কী ?
(গ) রাহেলা বানু দুমুঠো চাল কলসিতে জমিয়ে রাখে কেন ?
(ঘ) লোকজন গোল হয়ে বসে কী করছিল ? তারা কী শুনতে পেল ?
(ঙ) জসীম কে ? কারা, কীভাবে তাকে হত্যা করেছিল ?
(চ) গভীর রাতে রুমা-রুবাদের বাড়িতে কারা আসত? তারা কাদের সঙ্গে লড়াই করেছিল ?
(ছ) রুমা ও রুবা রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না কেন ?

৮. কর্ম-অনুশীলন।

আমার বাবা-মা, দাদা-দাদি বা পাড়া-প্রতিবেশীদের নিকট থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গল্প শুনে তা লিখি ও শ্রেণির সহপাঠীদের পড়ে শোনাই।

লেখক পরিচিতি সেলিনা হোসেন	সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার। তিনি ১৪ই জুন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা একাডেমীতে পরিচালক পদে থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। 'সাগর', 'গল্পে বর্ণমালা', 'কাকতাড়ুয়া', 'চাঁদের বুড়ি পান্তা ইলিশ' ইত্যাদি তাঁর লেখা শিশু-কিশোর উপযোগী বই। তিনি সাহিত্যকর্মে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কারসহ বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

সমাপ্ত

২০১৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য ৫-বাং

পরনিন্দা ভালো নয়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত– বিক্রয়ের জন্য নয়।